

# মানিকদার সঙ্গে



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আজকাল



# মানিকদার সঙ্গে

---

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আজকাল

মানিকদার সঙ্গে  
স্মৃতিচারণ  
Manikdar Sange  
a memoir by Soumitra Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ  
বইমেলা ১৯৯৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর ১৯৯৩  
পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৯৮  
চতুর্থ মুদ্রণ: জুলাই ২০০২, পঞ্চম মুদ্রণ:  
জানুয়ারি ২০০৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৮  
সপ্তম মুদ্রণ: জানুয়ারি, ২০১১

প্রচ্ছদ: দেবব্রত ঘোষ

ISBN-81-7990-052-2

© লেখক

প্রকাশক ও মুদ্রক: জ্যোতিপ্রকাশ খান  
আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড  
বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১  
মুদ্রণ: ইউনিক কালার প্রিন্টার  
২০এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৬০ টাকা



সত্যজিৎ রায় প্রয়াত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ‘আজকাল’-এর পাতায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচারণা করেছিলাম। এই লেখা নিতান্তই ব্যক্তিগত। সত্যজিৎ রায়ের মত বিশাল ব্যক্তিত্ব ও মহান শিল্পীর কোনও সমগ্র পরিচয় বা মূল্যায়নের চেষ্টায় তা লেখা হয়নি। শোকসন্তপ্ত মন ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করে যেমন উদ্বেল হয় তেমনি অপরাপরকে বলতে পারলে বিয়োগব্যথার ভার লাঘব হয়। খানিকটা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ওই লেখা শোকার্ত সময়ের মধ্যে উৎসৃত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণা হলেও ওই লেখার মধ্যে দিয়ে মানুষ সত্যজিৎ ও তাঁর শিল্পীসত্তার কিছু পরিচয় ব্যক্ত হয়ে থাকতে পারে এই বিশ্বাসেই ওই লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগে আমি সম্মত হই। গ্রন্থাকার ধারণের জন্যে সামান্য কিছু ঘষামাজা বা স্থানাভাবে বর্জিত কিছু অংশ পুনর্যোজনা করা ছাড়া লেখাটির মূল চরিত্র পাশ্টানোর কথা আমি ভাবিনি। কারণ তখনকার আঘাত পাওয়া মনে অনর্গলিত আবেগের মধ্যে সেই বড় মানুষটি সম্পর্কে আমার যে শ্রদ্ধানিবেদন প্রকাশ পেয়েছে, গ্রন্থের আধারে তাই ধরা থাক এই আমি চেয়েছি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১৮ জানুয়ারি, ১৯৯৩

গল্ফ গ্রিন

কলকাতা-৭০০০৪৫

শ্রীমতী বিজয়া রায়কে





# সে

ই প্রথম দেখা, উনি মঞ্চে আর আমি ভিড় উপচে-পড়া দর্শকদের একজন। দীর্ঘদেহ, উজ্জ্বল চোখ, পরনে একটা সুন্দর চাপা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি আর খুতি— সব মিলিয়ে অনেক মানুষের মাঝে প্রথমেই চোখে পড়ার মত সুপুরুষ চেহারা।

সেনেট হলের সেই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন কলকাতার সাহিত্যিক, শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীরা। যতদূর মনে পড়ছে উদ্যোগটা ছিল প্রধানত সাহিত্যিকদেরই। তখনকার তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত লেখকও ছিলেন সেই সভায়, যেমন— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো ছিলেনই। তরুণ লেখক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন উদ্যোক্তাদের একজন, তাঁর মাধ্যমে খবর পেয়ে আমরাও হাজির হয়েছিলাম।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর ‘পথের পাঁচালী’-র ইউনিটের অনেকেই ছিলেন— করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরত মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, অপু যে করেছিল সেই সুবীর। তখন ঠিক ভাল করে খেয়াল করিনি ঠিক কে কে ছিলেন। তবে কানুদা, করুণাদি, সুরত মিত্র ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত— এঁরা যে ছিলেনই তা বিশেষভাবে মনে আছে এইজন্য যে, এঁদের সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ জন্মেছিল সেই সভায় যাওয়ার আগেই, নিশ্চয়ই অন্যরাও ছিলেন। দূর থেকে দেখার সেই প্রথম সুযোগেই মানিকদা তাঁর নিজের কথায় আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। সংবর্ধনা সভায় অনেক গুণিজন তাঁর ছবি ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে বিস্তারিত প্রশংসা করেছিলেন, প্রাসঙ্গিকভাবে ছবির পরিচালকের চিন্তা ও মানসিকতা নিয়েও অনেকে অনেক কথা বললেন। একটা প্রসঙ্গ বিভিন্ন বক্তার কথায় বার বার ঘুরে-ফিরে হাজির হতে লাগল— ‘এ ছবিতে কোনও কমার্শিয়াল উপাদান নেই, বক্স অফিসকে অগ্রাহ্য করেই এ ছবি তৈরি হয়েছে।’ বক্স অফিস বলতে তখনও পর্যন্ত বোঝাত জনমনোরঞ্জননের জন্য যেসব চেনা ফর্মুলা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাই-ই। অনেক বক্তা এ ধরনের কথা বার বার বলার পর সভার শেষ বক্তা হিসেবে পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করে প্রথমেই বললেন— ‘একটা কথা

বলে রাখা ভাল যে, এখানে অনেক বক্তাই বললেন যে এ ছবি বক্স অফিসকে অগ্রাহ্য করে তৈরি করা হয়েছে। আমি কিন্তু তা করিনি। আমি কেন, কোনও পরিচালকই চাইবেন না যে ছবিটা শুধু তাঁকেই ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে দেখতে হবে। মানুষের জন্যই তো ছবি, প্রত্যেকেই চান তৈরি ছবিটা যত বেশি সম্ভব দর্শকরা দেখুন। নিজের ছবি সম্পর্কে আমিও তাই চেয়েছি। আমি কখনও বক্স অফিসকে অস্বীকার করে ছবি করতে চাইনি, তবে ‘বক্স অফিস’ বলতে যে ধারণা প্রচলিত আছে, আমার নিজের ধারণা তার চেয়ে একটু আলাদা। আমি জানি প্রচলিত বক্স অফিস-উপাদান ছাড়াও দর্শকদের মনোরঞ্জন করা যায়, আমি সেই চেষ্টাই করেছি।’— কথাগুলো কতদূর সত্য তা আমি সারাজীবন ধরে বুঝেছি, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রসিকরা বুঝেছেন। নিজের শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং আশ্চর্য প্রত্যয় না থাকলে ‘পথের পাঁচালী’র মত ছবি দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালক-জীবন শুরু হত না বলে আমি বিশ্বাস করি।

কথাগুলো শুনে আমি, আমার খুব কাছের বন্ধুরা একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম এই ভদ্রলোক একেবারে আলাদা জাতের স্রষ্টা, যিনি একা নিজের পথ তৈরি করে বাংলা চলচ্চিত্রকে অনাবিষ্কৃত জগতে পৌঁছে দেবেন। মনের মধ্যে অন্যরকম এক আলোড়ন শুরু হল সেই সেনেট হলের বক্তৃতা থেকেই।

মানিকদাকে নিয়ে স্মৃতিকথা শুরু করলে যা প্রথমেই মনের মধ্যে উঁকি দেয় তা মানিকদার ছবি, তিনি নন। পঞ্চাশের সেই গোড়ার দিকের বছরগুলোয় আমাদের বন্ধুদের প্রত্যেকেরই বাড়ি-বাসা জাতীয় বলে একটা পদার্থ থাকলেও আসল ঠিকানা ছিল— কেয়ার অফ কফি হাউস। দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা জুড়ে ম্যারাথন আড্ডা চলত। জীবনের, জগতের যত কথা— সবই আলোচিত হত সেখানেই। সেখানেই শুনতে পেলাম ‘পথের পাঁচালী’ ছবি হচ্ছে। ‘পথের পাঁচালী’ তখন আমাদের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি সারাক্ষণ ধরে রাখার মত উপন্যাস। কে ছবি করবেন? তীব্র কৌতূহল, সকলেরই। শুনলাম ‘সিগনেট’ থেকে প্রকাশিত ‘আম আঁটির ভেঁপু’-র প্রচ্ছদ যিনি এঁকেছেন, সুকুমার রায়ের ছেলে, সত্যজিৎ রায় সেই ভদ্রলোকই পরিচালক, পেশায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।

ছবি শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর যখন ‘পথের পাঁচালী’ রিলিজ হল তখন আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম দিন ছবিটা আমার দেখা হয়নি। তা আমি

দেখিনি তো কী হয়েছে, আমাদের আড্ডার সতত-উচ্ছ্বসিত সদস্যরা তো দেখেছে। পরের দিনের দুপুর বোধহয় উদ্বেল আনন্দের অশ্রুতে ভেসে গিয়েছিল। সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল। পরের দিনই দেখতে গেলাম, দেখার পর যা হওয়ার তাই হল, সারাক্ষণই মনের মধ্যে ‘পথের পাঁচালী’। কয়েকদিনের মধ্যে কতবার যে ছবিটা দেখেছিলাম তার কোনও হিসেব নেই। মনে আছে নির্মাল্য (আচার্য) প্রথম দিকে বার ছয়েক দেখার চেষ্টা করেও পুরোটা দেখতে পারেনি। কী করে দেখবে? শেষের দিকে প্রতিবারই কেঁদে ফেলত, দু চোখে জল নিয়ে তো আর সামনের কিছু দেখা সম্ভব নয়। তারপরের দিন-রজনী শুধুই ‘পথের পাঁচালী’, একেবারে মুহাম্মান অবস্থা।

তখনই ওয়ার্ল্ড সিনেমা সম্পর্কে একটা যে বেশ বিস্তৃত ধ্যান-ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে তা নয়। কিছু খবর অবশ্যই রাখতাম, কারণ তার মধ্যে আমাদের দেশে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়ে গেছে, হলিউডের ছবি তখন নিয়মিত কলকাতায় দেখানো হত। ফলে কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি দেখে ফেলেছি, যেমন— ‘বাইসাইকেল থিফ’, ‘মিরাকল ইন মিলান’, ‘ফল অফ বার্লিন’ ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে সিনেমা সম্পর্কে একটা নতুন চেতনার উন্মেষ হচ্ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি তখন থিয়েটার নিয়েই খুব ব্যস্ত, দল তৈরি করে নাটক করছি, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও প্রবল উদ্যমে নাট্যচর্চা চলছে। শিশিরবাবুর কাছে যাচ্ছি। নিজের জীবনে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি যে আমি অভিনয়ই করব। ‘পথের পাঁচালী’ এইরকম মানসিক অবস্থাতে একটা বড় ধাক্কা দিল। হলিউডের বিখ্যাত ছবিগুলো দেখার পরিপ্রেক্ষিতেও আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ‘পথের পাঁচালী’ একটা অসামান্য সৃষ্টি। পরিস্কারভাবে বলি, তার আগে বাংলা সিনেমা সম্পর্কে আমার উঁচু ধারণা ছিল না। সিনেমায় অভিনয় নিয়ে আমার মনে এক ধরনের অনীহা ছিল, এসব সিনেমা সম্পর্কে তখনকার ভুল ধারণার প্রতিফলন। আমরা সিনেমাকে তখনও তেমন আমল দিতাম না, বরং থিয়েটার করব, থিয়েটার নিয়েই থাকব এমন বাসনাই তখন অদম্য হয়ে উঠেছিল।

সেনেট হলের সেই সভার পর কিছুদিনের মধ্যেই একদিন বিকেলে কফি হাউস যাচ্ছি, তখন আমি মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকি, আমার এক বন্ধু রাস্তার ওপার থেকে আমাকে ডাকল (প্রসঙ্গত বলে রাখি, মানিকদার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অনেক স্মৃতি আমি এর আগেও অনেকবার বলেছি এবং লিখেছি, সেইসব বলা

কথাও আবার হয়ত এসে যাবে, কারণ আজ আমার মনের দরজা খুলতেই অনর্গল স্মৃতির প্রবাহ বন্যার মত আছড়ে পড়ছে। আমি একটু অবাক, কারণ আমি তো আমাদের যৌথ গন্তব্যস্থলের দিকেই যাচ্ছি। কাছাকাছি যেতেই দেখি অরুণ ফুটপাথের ওপারে কারও সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা বলছে। আমি বললাম— ‘কী হল? কার সঙ্গে কথা বলছিস?’ তখন সে বলল— ‘তাহলে তোকে সব খুলেই বলি, ‘পথের পাঁচালী’-র পর সত্যজিৎ রায় ‘অপরাজিত’ করবেন, ‘অপু’ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একজন নতুন অভিনেতা খুঁজছেন, আমি তোর কথা বলেছি। ওই ভদ্রলোক সত্যজিৎ রায়ের ইউনিটের একজন, নাম নিত্যানন্দ দত্ত, তা তোর কি কোনও আপত্তি আছে?’ আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম— ‘না, ওঁর ছবি হলে আমার কোনও আপত্তি নেই।’ নিতাইকে (নিত্যানন্দ) তখন ডাকল অরুণ। নিতাই অবশ্য একটা কথা প্রথমেই বলে নিয়েছিলেন— ‘যদি সত্যজিৎবাবুর পছন্দ না হয়...’ আমিও পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম— ‘না, তাতে কোনও অসুবিধে নেই, যদি পছন্দ হয়, তাহলে তো দারুণ ব্যাপার...’ ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠে পড়লাম। নিতাই (পরে আমরা দ্রুত পরস্পরের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম) কেন সত্যজিৎ রায়ের যোগ্য সহকারী তা তখনই বুঝেছিলাম। তখন আমার চোখে চশমা ছিল। নিতাই আমাকে বাসে যেতে যেতে বলল— ‘আপনার চোখের চশমাটা খুলে ফেলুন তো!’ আমিও চশমাটা খুলে পকেটে ভরে নিলাম। ভিড়ের বাস, সহকারী পরিচালক মাঝে-মাঝেই আমাকে ঘুরেফিরে দেখতে লাগল।

দুই

মানিকদা তখন লেক অ্যাভেনিউতে থাকতেন, নিজের ঘরে সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন, আমি ঘরে ঢোকামাত্রই বলে উঠলেন— ‘এঃ হে, আপনি যে বড্ড লম্বা হয়ে গেলেন।’ বলেই সামলে নিয়ে বললেন— ‘আসুন আসুন, বসুন।’ কথাটা আমাকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। একজন মানুষ কতটা একাগ্রচিত্তে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে এভাবে কথা বলতে পারেন। মানে তিনি সারাক্ষণই তখন মনে মনে অপু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আমাকে বসিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তখনই তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিতি পেয়ে গেছেন, প্রাইজ ইত্যাদিও পেয়ে গেছেন। আমার মত সাধারণ, অপরিচিত ছেলের সঙ্গে তিনি অতক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন, ব্যাপারটা আমাকে খুব স্পর্শ করল। সকলের সঙ্গে খুব সহজ ও আন্তরিকভাবে কথা বলতেন, এই ব্যাপারটা আমি সারাজীবন ধরেই লক্ষ্য করেছি।

গলার গম্ভীর আওয়াজ, বিরাট চেহারা— সব মিলিয়ে সব সময়েই সাধারণের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ইমেজ তৈরি হয়ে যেত, তিনি নিজে চেষ্টা করে কখনও কোনও ব্যবধান সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু যতই মজার হালকা কথাবার্তা বলুন না কেন, কেউ তাঁর সঙ্গে ছাবলামি করবে, এ ব্যাপারটা চিন্তাই করা যেত না। অথচ তিনি উপযুক্ত সময়ে অনেকের সঙ্গে একেবারে বন্ধুর মত ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেন, আমার সঙ্গে তো করতেনই।

তখনও বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছি মানিকদা কোনও নতুন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রথমে কথা বলার মধ্যেই প্রাথমিক কতকগুলো যোগ্যতা মেপে নিতেন। কেমনভাবে কথা বলে, গলার আওয়াজটা কেমন, উচ্চারণ কেমন, চোখ-মুখের ভঙ্গি কেমন হয়, শুছিয়ে বাংলা ভাষাটা বলতে পারে কিনা ইত্যাদি। বিশেষ করে বাংলা বলার যোগ্যতাকে উনি খুবই গুরুত্ব দিতেন, একেবারে শুরু থেকেই সেটা লক্ষ্য করেছি। কী ধরনের শব্দ সাধারণ কথা বলার সময় ব্যবহার করছে ইত্যাদি। পরে আরও অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁরা কিন্তু সাধারণভাবে এই ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সংলাপ বলা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, তা তাঁর সঙ্গে যঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন।

সরাসরি আলাপের সেই প্রথম দিনে অনেক কথার মধ্যে উনি দুটো প্রশ্ন আলাদা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি সত্যিই অভিনয় ভালবাসি কিনা এবং পরে প্রয়োজনবোধে আমি সিনেমায় অভিনয় করব কিনা। মানে এটাও উনি লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন যে আমার অভিনয়ের আগ্রহ ঠিক কতটা গভীর। মনের মধ্যে ‘পথের পাঁচালী’র প্রতি সম্মোহনী প্রেম এবং সামনে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়, সুতরাং আমার উত্তর যা হওয়ার তাই-ই হয়েছিল।

উঠে আসব, তার আগে মানিকদা হঠাৎ বললেন— ‘আচ্ছা, সৌমিত্রবাবু, আপনি ঠিক কতটা লম্বা বলুন তো?’ আমি বললাম— ‘পাঁচ ফুট, সাড়ে এগারো।’ উনি অনিল চৌধুরি, ওঁর প্রোডাকশন ম্যানেজার, তাঁকে ডেকে

বললেন— ‘অনিলবাবু, আপনি ওঁর পাশে দাঁড়ান তো।’ চলে আসার সময় আবার বললেন— আপনি মাঝে মাঝে আসবেন, যোগাযোগ রাখবেন ইত্যাদি।

প্রথম আলাপের পর উনি যেতে বললেও আমি কিন্তু অনেকদিন যাইনি। অতবড় একজন মানুষ, ওঁর কাছে গিয়ে কাজের মাঝখানে আবার বিরক্ত করব— এইসব সাতপাঁচ ভেবেই যাইনি। তবে প্রথম সাক্ষাতের পর আমি দু-তিনজন বন্ধুকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম যদি অপূর জন্য তাদের কাউকে ওঁর পছন্দ হয়। তা অবশ্য হয়নি। তারপর উনি শেষ পর্যন্ত ‘অপরাজিত’-তে স্মরণ ঘোষালকে নিয়েছিলেন। ‘অপরাজিত’ মুক্তি পাওয়ার পর আবার আলোড়ন, আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল, সত্যিই অসাধারণ ছবি। বহু দৃশ্যের অসাধারণত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম— কাশীর গঙ্গার ঘাট, হরিহরের মৃত্যু, অপু সেই বৃদ্ধের মাথার চুল বেছে দিচ্ছে, তারপর পয়সা পেয়েই ছুট, অপূর কাফ্রি বেশে ‘আফ্রিকা’ বলে চিৎকার, ইচ্ছে করে ট্রেন ফেল্ করে বাড়ি আসা, প্রথম কলকাতা আসা ইত্যাদি অনেক দৃশ্যের কথা এখনও মনের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেওয়া আছে, মাঝে মাঝে মনে পড়ত, এখন আরও বেশি মনে পড়ছে।

তখন যৌবনের দিনগুলো রাজার মত ছড়ি ঘোরাচ্ছে আর কফি হাউসে আড্ডা চলছেই। কফি হাউসে আড্ডা দিতে আসতেন মানিকদার আর একজন সহকারী, সুবীর, সুবীর হাজরা। তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে বলতেন— ‘তোমাকে কিন্তু ওঁর মনে আছে, তোমাকে কিন্তু উনি ডাকবেন...’ ইত্যাদি। আমি বলতাম— ‘ধ্যাৎ, তুমি থাম তো, আমাকে আবার ডাকতে যাবেন কেন’... এইসব। স্বাভাবিকভাবেই ভাবতাম সে-সব হেঁদো কথা। এরপরই আমি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি নিলাম, তখন গার্স্টিন প্লেস-এ রেডিও অফিস, সেটা বোধহয় ১৯৫৭ সাল। সেই বছরই চিকেন পক্স নিয়ে শুয়ে থাকলাম বেশ কিছুদিন। সুস্থ হয়ে উঠে স্মৃতিচিহ্নের ওপর হাত বোলাচ্ছি, এমন সময় একদিন সুবীর সোজা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির— ‘চল, সত্যজিৎ রায় তোমাকে ডেকেছেন।’ আমি কয়েকদিন পরেই গেলাম। ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলেন— ‘আরে! আসুন। এ তো ঠিকই আছে, মুখে তো বিশেষ দাগ হয়নি, কে যেন বলছিল মুখে অনেক দাগ হয়ে গেছে। এ কিছু না, সব ঠিক হয়ে যাবে।’ একটু থেমে, হেসে বললেন— ‘তা অভিনয়ে আগ্রহ আগের মতই আছে তো?’ আমি মাথা নিচু করে বললাম— ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।’

যাই হোক সেই সাক্ষাতে মানিকদা কিছু কথাবার্তার পর বললেন যে তিনি ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের পরবর্তী অংশ নিয়ে আরও একটা ছবি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখানে আমাকে হয়ত ওঁর কাজে লাগবে। সহজ করে কথা বললেও অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কথা বলতেন, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে বললেন— ‘আমি এক্ষুনি আপনাকে কোনও কথা দিচ্ছি না, তবে আপনি মনে মনে তৈরি থাকুন।’ সত্যজিৎ রায়ের মত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশায় আমি যে মনে মনে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলাম, তা আর ওঁকে তক্ষুনি বলতে পারিনি, স্বাভাবিক সঙ্কোচে। আরও বললেন— ‘একদিন আপনার একটু ‘স্ক্রিন টেস্ট’ নেব, খুব সহজ ব্যাপার।’ অনেকক্ষণ আরও অনেক কথা বলার পর আবার বললেন— ‘আসুন না একদিন আমার গুটিং দেখতে।’

তখন উনি প্রায় একই সঙ্গে দুটো ছবির গুটিং করছিলেন— ‘পরশপাথর’ এবং ‘জলসাঘর’। আজ, এতদিন পরেও ওই জাতের দুটো ছবির কাজ একইসঙ্গে করার জন্য কতটা উদ্যম ও প্রতিভার প্রয়োজন হয় তা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই। প্রথমে ‘পরশপাথর’ শেষ হয়, তারপর ‘জলসাঘর’। ওঁর কাছে যাতায়াতের সেই সময়ে উনি যে করেই হোক জানতে পেরেছিলেন যে আমার সঙ্গে শিশিরকুমারের একটা নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আমি যে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যাই, তাঁর সংগ্রহ থেকে বই নিয়ে পড়ি এবং আমি তাঁকে বিভিন্ন ধরনের বই জোগাড় করে দিই পড়ার জন্য— এ খবরও পেয়ে গিয়েছিলেন। নানা ধরনের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে উনি শিশিরকুমারের খবর জানতে চাইতেন। শিশির ভাদুড়ী কী ধরনের বই পড়েন, কী ধরনের বই পড়তে ভালবাসেন ইত্যাদিও জানতে চাইতেন। আমার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে কী ধরনের কথা হয়— এই সব।

আমি সাহিত্যের ছাত্র জেনে, মানিকদা কখনও কখনও সেই বিষয়েও আলোচনা করতেন। কোনও নবাগত অভিনেতার সঙ্গে আলোচনা— বিশেষ করে সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা— এটা বাংলা ছবির পরিবেশে তো অকল্পনীয় ব্যাপার এবং দু-চারজন সংস্কৃতিবান উচ্চশিক্ষিত পরিচালক ছাড়া পরেও এমন মানুষ বেশি চোখে পড়েনি।

নির্দিষ্ট দিনে ‘পরশপাথর’ ছবির গুটিং দেখতে গেলাম। গিয়ে বংশী চন্দ্রগুপ্তের সেট দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কেউ এইভাবে সেট তৈরি করতে পারেন? তখন ব্যাপারটা ভাবতেই পারতাম না। বলে রাখি, মানিকদার

প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’ থেকেই আমরা ক্যামেরাম্যান সূত্রত মিত্র এবং বংশী চন্দ্রগুপ্তের একেবারে ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমরা এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিস্তার আলোচনা করতাম, দুজনেই যেন আমাদের কাছে ‘ডেমি গড’। বলতাম, একজন বড় পরিচালকের ইউনিট এই রকমই হওয়া উচিত। তখনও সেট তৈরির কাজ শেষ হয়নি, ফিনিশিং টাচ চলছে, অবাক হয়ে খুব কাছে গিয়ে প্রায় হাঁ করে দেখতে লাগলাম। মানিকদা তখন গুটিংয়ের আয়োজন করছেন, এক ফাঁকে দেখলেন যে আমিও সব দু’চোখ দিয়ে গিলছি। পরে বুঝেছিলাম মানিকদা আমারই সুবিধার্থে এই সব করেছিলেন, সিনেমার নিজস্ব জগতের সমস্ত দরজা-জানলা খুলে দিচ্ছিলেন যাতে আমি সহজ হতে পারি, অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি।

সেদিন ‘পরশপাথর’-এর সেই বিখ্যাত পার্টি সিন-এর গুটিং হবে। তখনকার দিনে বাংলা ছবির প্রায় সব বিখ্যাত অভিনেতা সেদিনের গুটিংয়ের জন্য হাজির ছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতার কীভাবে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করেন, তাঁদের আচরণে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে ওঠে, সবই আমাকে দেখার সুযোগ করে দিলেন মানিকদা। এককথায় বলতে গেলে আমাকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন, যাতে আমি ভয়টয় না পাই।

তখনও মানিকদা আমাকে ‘আপনি’ বলেন এবং একবারও বলেননি যে আমি ‘অপু’ চরিত্রে অভিনয় করব। ভেবেছিলাম কোনও একটা ছোট চরিত্রে কাজ করতে বলবেন। অথবা এমনও হতে পারে উনি কোনওদিন ইঙ্গিতে কিছু বলে থাকবেন, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

গুটিং দেখতে আসা-যাওয়ার মধ্যের দিনগুলোতে আমার চোখের সামনে সিনেমার প্র্যাকটিক্যাল দিকগুলো একটু একটু করে স্পষ্ট হতে লাগল। রেডিওতে চাকরি করি আর সুযোগ পেলেই মানিকদার ছবির গুটিং দেখতে যাই। একদিন ‘জলসাঘর’-এর গুটিং দেখতে গেছি, মানিকদা যথারীতি আমাকে একটা সুবিধাজনক জায়গায় বসালেন। সারাদিন কাজ হওয়ার পর বিকেলে আমি আমার রেডিওর চাকরিতে যাব, গিয়ে বললাম— ‘মানিকবাবু, এবার আমি যাই।’ সাতাল সালের সেই সময় পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ‘আপনি’ এবং ‘বাবু’ সহজ চেহারায় হলেও ছিল। তার কিছুদিন পরেই ওই দুটো শব্দ চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছিল। আমি যে ‘আপনি’ এই সেদিন পর্যন্ত ব্যবহার করেছি, তা চরিত্রে ও অন্তরঙ্গতায় ‘তুমি’-র খুব কাছাকাছি। চলে



আসব বলে বিদায় নিতে গিয়েছি, উনি হঠাৎ আমাকে বললেন— ‘আসুন, আপনার সঙ্গে ছবি বিশ্বাসের আলাপ করিয়ে দিই, আলাপ নেই তো?’ আমি ঘাড় নাড়লাম। হঠাৎ ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, মানে কী? মনে মনে আমি যতটা খুশি, প্রায় ততটাই অবাক। ছবি বিশ্বাসের কাছে গিয়ে ওঁর সেই জোরালো ভারি গলায় বললেন— ‘ছবিদা! এঁর নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ইনিই আমার পরের ছবি ‘অপুর সংসার’-এর অপু।’ ব্যস, আমার চোখের সামনে যেন জলসামুদ্রের সেটের ঝাড়লঠন দূলে উঠল, পায়ের তলায় মাটি নেই, নক্ষত্রদের হাত ধরে উড়ছি। তখনই প্রথম বুঝলাম, উনি আমাকে বরাবর ‘অপু’-র জন্যেই ভেবেছিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে বাসে যাচ্ছি রেডিওর কাছে, মনে হতে লাগল বাসটা কেন উল্টার গতিতে ছুটছে না, সে এক বাঁধনহারা আনন্দের অভিজ্ঞতা।

তার পরের সময় দ্রুত কেটে যেতে লাগল। জানলার ধারে খুলে-রাখা বইয়ের পাতার মত দিনগুলো এসেই হারিয়ে যেতে লাগল। তখনই যে স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠল, উনি যেন পিতৃস্নেহে আমাকে আগলে রাখতে লাগলেন। লেক অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে আমার যাওয়াটা আলাদা করে আর কিছু উদ্যোগের ব্যাপার রইল না।

নিজেই ওঁর ঘরে আমার অনেকগুলো ছবি তুলেছিলেন, স্টিল ফটোগ্রাফ, তা নিয়ে বৌদি এবং ইউনিটের সঙ্গে আলোচনা করলেন। মানিকদার এই ধরনের কাজে ঘনিষ্ঠরা সকলেই অংশ নিয়েছেন, চিরকাল। আমার ছবি নিয়ে উনি আমার সঙ্গেই আলোচনা করেছেন। আমাকে অপু-তে রূপান্তরিত করে নেওয়ার জন্য ‘অপরাজিত’ উপন্যাসটা আরও একবার ভাল করে পড়ে নিতে বললেন। অভিনয়-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমি সেই সময় পর্যন্ত কী কী বই পড়েছি তা নিয়ে আলোচনা করলেন। যা যা পড়িনি তা-ও পড়তে বললেন। স্ট্যানিস্লাভস্কি-র ‘মাই লাইফ ইন আর্ট’ আর ‘বিশ্টিং আ ক্যারেক্টার’ আমার পড়া ছিল। একদিন গল্পগুজবের পর বললেন— ‘সৌমিত্র, স্ট্যানিস্লাভস্কির ‘অ্যান অ্যাক্টর প্রিপেয়ারস’ পড়েছ? আছে তোমার কাছে?’ আমি বললাম— ‘না, আমি ওটা পাইনি।’ উনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে ওঁর কপিটা আমাকে পড়তে দিলেন। জীবনে কখনও মানিকদাকে পশ্চিতি আলোচনা করতে দেখিনি, অথচ ইচ্ছা করলেই বিচিত্র বিষয় নিয়ে যে ক্লাস নিতে পারতেন এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনও সুযোগ নেই। অল্প কথায় নিজের প্রয়োজনীয় কথাটা

বলতেন। স্ট্যানিস্লাভস্কির বইটা হাতে দিয়ে বললেন— ‘বিগিনার্সদের পক্ষে বইটা খুব ভাল, পড়লেই বুঝতে পারবে।’ পরে আরও ওই ধরনের বই দিয়েছিলেন। অসীম পড়াশোনা, মেধা এবং বইপত্রের সংগ্রহ যাঁর তিনি এক আশ্চর্য সংযমে শুধু প্রয়োজনীয় কথাটা বলেছেন— এটাও যথার্থ একজন বড়মানুষের লক্ষণ। এদেশে ক’জন সত্যজিৎ রায়ের মত বাংলা-ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারেন তা রসিক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাট্রেই জানেন, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। পণ্ডিতের ভান করা, লোককে পাণ্ডিত্য দেখানো ব্যাপারটা উনি অপছন্দ করতেন।

## তিন

একজন অসাধারণ মানুষের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান, বিবেচনা, সাহায্য যদি বাস্তবের চেহারা জমিয়ে রাখা যেত তাহলে সেই সব সঞ্চয় নিয়ে আমি চলাফেরা করতে পারতাম না। মানিকদার সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই আলোচনা হত, কিন্তু সিনেমা নিয়ে আলোচনার সময় আমার কান দুটো একটা শব্দও হারাতে চাইত না। জিজ্ঞাসা করতেন, এ পর্যন্ত ভাল ইংরেজি ছবি বলতে কোন ছবিগুলো দেখেছি। বুঝতাম আমার মধ্যেই ‘অ্যান অ্যাক্টর প্রিপেয়ার্স’-এর কাজ চলছে। একদিন বললেন— ‘লস্ট উইকএন্ড দেখেছ?’ আমি বললাম— ‘না’। বললেন— ‘তুমি চলে এস, পরের রবিবার সকালে বসুশ্রীতে আমরা ছবিটা দেখতে যাব।’ আগেই বলে রাখলেন— ‘এই ছবিটা দেখা খুবই প্রয়োজন, বিলি ওয়াইল্ডারের মত বড় পরিচালকের কাজ, আর লক্ষ্য করবে রে মিল্যান্ড-এর অভিনয়, সিনেমা-অ্যাক্টিং কাকে বলে। সিনেমা-অ্যাক্টিং কীভাবে করতে হয়...।’ আমি জানি না তখন মানিকদার সঙ্গে ঠিক কী সম্পর্ক, গুরু-শিষ্য না অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধু, বোধহয় সবই। এইভাবেই মানিকদা আমাকে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

‘অপুর সংসার’-এর শুটিং শুরু হবে। সেই দিনটা আমার আজও মনে আছে, এ জীবনে সেই দিনটাকে ভুলতে পারব না— ৯ আগস্ট, ১৯৫৮। নিজের ছবি কেমন উঠবে তা নিয়ে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিল, ভাবতাম আমি মোটেই ফোটোজিনিক নয়। পরক্ষণেই ভেবেছি, যা আছে তা আছে, সে-

সব মানিকদা-সুত্র মিত্র ওঁরা বুঝবেন। এর আগে জলসাঘরের শুটিংয়ের শেষদিনে, যেদিন সেই ছবির টাইটেল শটগুলো নেওয়া হচ্ছিল সেইদিন আমার স্ক্রিন-টেস্ট হয়েছিল। আমার পরে মনে হয়েছে ওটার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কারণ তার আগে উনি আমার স্টিল ছবি নিয়েছিলেন অতএব আমার চেহারা-মুখ ক্যামেরায় কেমন তা ওঁর জানতে বাকি ছিল না। ওটাও আমাকে সাহস জোগানোর জন্য, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোটা যাতে আমার সড়গড় হয় সেইজন্য করা। কাণ্ডটা ঘটার পর হেসে বললেন— ‘বেশ ভালই হয়েছে বুঝলে, ইউ আর কোয়াইট কনফিডেন্ট।’

শুটিংয়ের বেশ কিছুদিন আগে মানিকদা আমাকে স্ক্রিপ্টের ফার্স্ট ড্রাফটটা পড়তে দিয়েছিলেন। তখন উনি ইংরেজিতে স্ক্রিপ্ট লিখতেন, ফুলস্কেপ কাগজে টাইপ করা। একজন মানুষ, তা তিনি যত বিখ্যাতই হন না কেন, তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা কখনও জন্মাতে পারে না যদি তাঁর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে। কী অসাধারণ স্ক্রিপ্ট। পড়তে পড়তেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শেষ দৃশ্যে যখন অপু কাজলকে কাঁধে নিয়ে কলকাতায় ফিরছে, পাশে নদী, নদীতে নৌকো, পালতোলা। শেষ কয়েকটা লাইন ছিল—

*Faces...*

*Where despair has given way to hope  
and bitterness to love.*

*And the river flows on...*

গোটা স্ক্রিপ্টেই অনেক অসাধারণ লাইন ছড়ানো ছিল। যারা ছবিটা দেখেছেন তাঁরা মনে করতে পারবেন সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটা— যেখানে অপু পাহাড়ের ওপর থেকে তার পাঙ্করের হাড়ের চেয়ে প্রিয় উপন্যাসের পাতাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে— তার জীবনে পাণ্ডুলিপির সমস্ত আয়োজন শেষ, পাতাগুলো উড়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে অরণ্যের ছায়ায় হারিয়ে গেল। মানিকদা লিখেছেন, আমার এখনও মনে আছে—

*Then Apu lets the whole manuscript go,  
and they seem like an enormous  
flock of some strange migratory  
birds disappearing into the depths  
of the mountain...*

একজন অভিনেতাকে একটা অনন্যসাধারণ চরিত্রের অভিনয়ে আরও কতভাবে সাহায্য করা যায়? বহু আলোচনা, চিত্রনাট্য দেওয়া, এরপরেও মানিকদা অপু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু'পৃষ্ঠার একটা নোটস্ আমাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। কেন অপু হঠাৎ ওইরকম পরিস্থিতিতে বিয়ে করতে রাজি হল? সে তো একজন আধুনিক, শিক্ষিত ছেলে, সে তো এ ধরনের প্রস্তাব উড়িয়েই দিতে পারত, অপূর মোটিভগুলো কী কী ইত্যাদি তাতে লেখা ছিল।

অপু ততদিনে আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তখন আমি একটা প্রায় ছেলেমানুষি কাজ করেছিলাম। নিজেই একটা সাব-টেক্সট তৈরি করেছিলাম। অপূর যে দৃশ্যগুলো তোলা হচ্ছে তার মধ্যের সময়ে অপু কী কী করতে পারে। মানিকদা কিন্তু আমার সেই কাজটাকে উড়িয়ে দেননি, যত্ন নিয়ে দেখেছিলেন, মাঝে মাঝে দু-একটা পরামর্শও দিয়েছিলেন— তুমি লিখেছ অপু এই কাজটা করতে গিয়েছিল, কিন্তু অপু তো ওটা না করে এটাও করতে পারত... ইত্যাদি। মূল ছবির দৃশ্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, ছিল না। কিন্তু আমার আবেগ ও অপু-চরিত্রের প্রতি আমার ভালবাসার প্রশ্নে সেই মোটা চেহারার ডায়েরিটার একটা মূল্য ছিল। এইভাবেই অপু-চরিত্র আমার মনের মধ্যে একটা গাছের মত আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছিল। এসবের প্রত্যক্ষ ফল হল যখন সত্যিকারের শুটিং শুরু হল তখন অপুকে আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। কী করে অভিনয়ের মধ্যে সেটাকে আনব শুধু সেটাই করতে বাকি ছিল। তখন আমার তাঁর ওপর অগাধ আস্থা জন্মে গেছে— অভিনয়ে কিছু ভুল করলে তো উনিই আছেন, নির্ভুলভাবে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেবেন।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, সারাজীবনে মানিকদার ছবিতে আমি প্রাণ খুলে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়ে অভিনয় করতে পেরেছি এবং সেটা সম্ভব হয়েছে তাঁরই জন্মে। সাধারণভাবে এ দেশের অনেকের ধারণা সত্যজিৎ রায় অতবড় পরিচালক, শুটিংয়ের সময় উনিই ডমিনেট করেন। আমার ক্ষেত্রে অস্তুত বলতে পারি ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হয়েছে। স্বাধীনতা গ্রহণ করার যে আত্মবিশ্বাস তা ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছি এবং সেই জন্মেই আমি নিজের খুশিতে কাজ করতে পেরেছি। সব সময়েই ভেবেছি, আমার ভুল হলে উনি তো আছেন।

প্রথম দিনের কাজ বেলেঘাটায়, তখন সি আই টি রোড ইত্যাদি কিছুই ছিল না। ওখানে কয়েকটা লেবেলিং অ্যান্ড বটলিং-এর কারখানা ছিল, ওখানেই

কাজ হবে। অপু চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে। প্রথম শটটা ছিল— অপু ছাতাটা হাতে নিয়ে একটা অঙ্ককার জায়গা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখে এল কীভাবে একেবারে অটোমেশন যন্ত্রের মত শিশি-বোতলে লেবেল লাগানোর কাজ চলছে। অপূর মুখটা শুকিয়ে যাবে। আমি নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে গিয়ে শটটা দিলাম।— কাজের ধরন দেখে অপু যখন নিজেই আবিষ্কার করল যে চাকরির যত প্রয়োজনই থাক, ঠিক এই কর্মটি তার দ্বারা হবে না। বাড়তি এক্সপ্রেসন হিসেবে আমি নিজেই একটা ছোট্ট করে ঢোক গিলেছিলাম। শট নেওয়া হয়ে গেলে মানিকদা ক্যামেরার পিছন থেকে বললেন— ‘এক্সপ্লেস্ট, ওকে’। সেই শুরু, একটা ছোট্ট ক্ষীণ বর্নার মত জলধারা এসে বিরাট জলধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বয়ে চলেছে। ‘অপূর সংসার’ ছবিতে আমি আমার প্রাণের আনন্দে অভিনয় করেছিলাম। সিনেমায় অভিনয় করা সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা ওই একটা ছবিতেই হয়ে গিয়েছিল। আমি কতটুকু কী করতে পেরেছিলাম তা দর্শকরা, সমালোচকরা বলবেন। নিজে প্রাণ ঢেলে অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি জানি যা করতে পেরেছিলাম তার অনেকটাই মানিকদার সৃষ্টি। প্রথম থেকেই গ্রহণ করার একটা প্রচণ্ড আগ্রহ, ভালবাসা আমার মধ্যে ছিল। উনি প্রথমেই পরিচালকদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যখন সিনটা পড়ে দিতেন তাতেই আমি বুঝতে পারতাম দৃশ্যটার মেজাজটা কী, ওঁর পড়ার শুণেই আমি চরিত্রের অ্যাগ্রোচ কেমন তা পরিষ্কার বুঝতে পারতাম। উনি অসাধারণ যত্নে ও ভালবাসায় শেখাতে চেয়েছিলেন আর আমি শিখতে চেয়েছিলাম। উনি যা চেয়েছিলেন তা ওঁকে অনুসরণ করেই করতে পেরেছিলাম বলে মনে হয়। উনিও তখন যথেষ্ট পরিণত বয়সের মানুষ নন, সেই প্রথম অ্যাডাল্ট অপুকে নিয়ে কাজ করবেন। সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক হয়ে কাজ করেছিলেন এবং আমাকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, উনি কিন্তু অন্য কোনও অভিনেতার জন্য এতটা সময় দেননি, এতটা উদ্যোগ নেননি। সুতরাং, সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকটাই মানিকদার প্রাপ্য।

একজন উঁচুদরের পরিচালকের ছবিতে, বাংলা ছবির পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা ভাবতে হবে, অভিনয়ের মান ঠিক কী হওয়া উচিত, তা কিন্তু ‘অপূর সংসার’ করতে গিয়ে বুঝিনি, তা আমি মানিকদার প্রথম দুটো ছবি ‘পথের পাঁচালী’ আর ‘অপরাজিত’ দেখেই একরকমের ধারণা করেছিলাম।

আমি সেইভাবেই, সেই ধ্যানধারণা নিয়ে শুরু করেছিলাম। ‘অপূর সংসার’-এর কাজ শুরুর আগের কথা তো বলেছি। ছবি শুরু হওয়ার পরেও আমি নিজে থেকে বাংলা ছবিতে অভিনয় কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করতাম। আমি চাইতাম বলেই উনি আলোচনা করতেন। এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি কেউ ওঁর কাছে কিছু জানতে চাইলে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেই বিষয়ে কথা বলতেন, কিন্তু নিজে থেকে কখনও কিছু বলতে চাইতেন না।

আমি নিজে সম্পূর্ণ সচেতন নই পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একজন পরিচালকের সঙ্গে তাঁর একজন অভিনেতার এতটা আন্তরিক সম্পর্ক কোথাও আছে বা ছিল কিনা। আজ ওঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে এতবার ‘আমি’ ‘আমি’ করতে হচ্ছে যে নিজেরই কানে লাগছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের অসহায়তা জানানো ছাড়া কীইবা বলতে পারি। ‘অপূর সংসার’ শুরু করার আগে মানিকদা আমার ভয়েস টেস্টের জন্য একটা আবৃত্তি করতে বলেছিলেন। আমি নিজে ওঁকে কখনও বলিনি যে আবৃত্তি করি। কিন্তু অন্য কারও কাছ থেকে বোধহয় শুনেছিলেন যে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে আমি প্রায় নিয়মিত আবৃত্তি করে থাকি। তো আমি রবীন্দ্রনাথের ‘বাঁশি’ কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলাম। একজন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নিয়ে বিচার করে দেখলে বলতে হয় ‘বাঁশি’ কবিতাটা যথেষ্ট সিনেমাটিক। মানিকদা টেকনিসিয়াল স্টুডিওতে আবৃত্তিটা রেকর্ড করে পরে সাউন্ড ভ্যান-এ এসে শুনলেন। পাশে ছিলেন চিত্রপরিচালক নীরেন লাহিড়ী, শোনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— ‘কেমন শুনলেন?’ নীরেন লাহিড়ীর সঙ্গে আমার আগেই খানিকটা পরিচয় ছিল, উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন— ‘ভাল, বেশ ভাল।’ মানিকদা গম্ভীর গলায় বললেন— ‘হ্যাঁ, বলুন।’ ভঙ্গিটা এইরকম— দেখেছেন তো, কেমন ছেলেটাকে আবিষ্কার করেছি। সারাজীবন ব্যাপারটা সম্পর্কে মনে হয়েছে উনি একইসঙ্গে আবিষ্কার, অধিকার মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব যেমন ছেলেদের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে সবসময় আড়াল করে রাখার চেষ্টা করেন, অনেকটা সেইরকমই। কিন্তু তাঁর অধিকারবোধ কখনও আমার নিজস্ব স্বাধীনতাকে খর্ব করত না। সেটা আরও স্পষ্ট বুঝেছিলাম পরবর্তী সময়ে। যখন অন্য পরিচালকের ছবিতেও কাজ করতে শুরু করেছি,

তখন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, মানিকদা, এই ছবিটা, ঐর ছবিটা করব কিনা, উনি আমাকে গাইড করতেন, তাতে আমার সুবিধেই হয়েছে। বিশেষ করে আমার অভিনয়-জীবনের গুরু দিকে তাঁর এই সহায় সাহায্য খুবই কাজে লেগেছিল। এটাও ওঁর মহত্ব, উনি ইচ্ছে করলেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলে বলতে পারতেন— এটা ভাই, তোমার ব্যাপার, তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।

তপন সিংহ ‘ক্ষুধিত পাষণ’ ছবির জন্যে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যথারীতি মানিকদাকে জিজ্ঞাসা করলাম ছবিটা করব কিনা। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন— ‘অবশ্যই, অবশ্যই তুমি ওঁর ছবিতে অভিনয় করবে।’ এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল, গল্পটা আমাকে তপনদাই বলেছিলেন। ‘অপূর সংসার’ মুক্তি পাওয়ার পর একটা পার্টিতে তপনদার সঙ্গে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের দেখা। তপনদা ছবিটার জন্য মানিকদাকে অভিনন্দন জানানোর পর আমার অভিনয়ের প্রশংসা করলে মানিকদা তাঁর পরিচিত ভারিগলায় বলেছিলেন— ‘হ্যাঁ, দারুণ, অনেকদিন পরে এবার একটাকে পাওয়া গিয়েছে বলুন।’ তারপর দুই সমবয়স্ক বন্ধুর হো হো হাসি।

## চার

‘অপূর সংসার’-এর শুটিং চলতে লাগল। মানিকদার নির্দেশে আগেই চুল বড় করতে হয়েছিল, মেকআপের সময় মানিকদা নিজেই অপূর চুল আঁচড়ে দিতেন। মানিকদার নির্দেশে দাড়ি রাখলাম, আবার কামিয়ে ফেললাম। অপূর ‘অপূর সংসার’-এ তাই কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দাড়ি দুই-ই ছিল। কারণ সেই সময় মানিকদা হঠাৎ বেশ অনেকদিনের জন্য আমেরিকায় চলে গেলেন। তখন সেই চিংপুর রেল ইয়ার্ডের বেলগাছিয়ার দিকটায় রেললাইনের ধারেই একটা বাড়িতে শুটিং হচ্ছিল। ছাতের ওপরে বৃষ্টির দৃশ্য তুলতে হবে, সেই যেখানে অপূ বৃষ্টিতে ভিজেবে আর বৃষ্টির জল বালতিতে ধরে জামাকাপড় ভেজাবে। কিন্তু অপূ কী করে এইসব কাজ করবে? বৃষ্টিই হচ্ছে না যে! দিনের পর দিন। লোকেশনে আমরা সবাই যাচ্ছি আর বসে বসে সারাদিন আড্ডা দিচ্ছি, বৃষ্টি তো দূরের কথা, মেঘই দেখা যাচ্ছে না, অথচ সেটা বর্ষার সময় ছিল।

এইরকমভাবে কয়েকদিন কাটার পর একদিন সকালে প্রাচীতে একটা সিনেমা দেখব বলে দীপার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সিনেমা দেখতে গেছি, ছবি দেখতে হলের মধ্যে ঢুকব, এমন সময় মেঘদূত উপস্থিত হলেন। মানিকদার প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরি এসে হাজির। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে অনিলবাবু বললেন— ‘এই শিগগির এস, ওদিকে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হতে পারে।’ ব্যস, আর সিনেমা দেখা হল না। সেদিন সত্যিই বৃষ্টি এসেছিল এবং শট নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

‘অপুর সংসার’ করার সময় আমরা সকলেই খুব আনন্দে কাজ করেছিলাম। সামান্য ব্যাপারেই খুশি হওয়ার মত মনও তখন আমাদের ছিল, তা সে আউটডোরে একে অন্যকে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেই হোক বা কলকাতার উপকণ্ঠে গুটিং করে ‘চাংওয়া’ রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেতে গিয়েই হোক।

‘অপুর সংসার’-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের গুটিং হয়েছিল চিড়িমিড়িতে। যেখানে অপূর সঙ্গে আবার পুলুর দেখা হচ্ছে, সেই দৃশ্যের টেক, তারপর যেখানে অপূ তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এক প্রায় অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তে পড়তে বলছে— ‘একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, কাজল আছে বলেই অপর্ণা নেই।’ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের গুটিং নিয়ে মানিকদা অত্যন্ত খুশি ছিলেন। একদিন কোনও একটা কথার মধ্যে মানিকদা বললেন— ‘তোমাকে নিয়ে তো কোনও চিন্তা নেই, চিন্তা হচ্ছে অন্যদের নিয়ে। দেখি অন্যদের কতটা কী করতে পারি...’ ইত্যাদি। কিন্তু মানিকদার চিন্তা না থাকলে কী হবে, আমার তো আমাকে নিয়ে খানিকটা চিন্তা থাকবেই। যদিও তখন ছবির অনেকটা কাজ হয়ে গেছে, বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জটিল শটের কাজ করতে পারছি, তবুও। সেই সময়ে একটা কাণ্ড করেছিলাম, যা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। পুলু যেখানে অপূর কাছে এসে তাকে ছেলের প্রতি কর্তব্য করতে বলছে— অপূ শুনছে না, সেই শটগুলোতেই কাণ্ডটা ঘটেছিল। মানিকদা বললেন— ‘সৌমিত্র, অপূ তো এখানে শরীরে ও মনে ক্লান্ত, আর ছুটে চড়াইয়ে উঠে পুলুর সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে, সেজন্য তুমি একটু হাঁপিয়ে কথাগুলো বলবে।’ যথা আজ্ঞা, আমি হাঁপানিটা রিয়েলিস্টিক করার জন্য রিহার্সালের ফাঁকে, শটের ফাঁকে ফাঁকে চড়াইয়ের দিকে ছুটে ছুটে সত্যি সত্যিই হাঁপিয়ে নিচ্ছিলাম। মানিকদা আমাকে নির্দেশ দিয়ে অন্য ব্যাপারগুলোর আয়োজন করছিলেন, আমার দিকে নজর দিতে



পারেননি, দিলে হয়ত আমার ভোগান্তিটা হত না। শটগুলো ঠিক হল, কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রম আর খাঁটি বঙ্গসন্তানের ওইরকম উচ্চস্থানের চড়াইয়ে রিয়েলিস্টিক ছুটোছুটিতে সন্ধ্যায় আমার সত্যি হাঁপ ধরে গেল এবং রীতিমত শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। শুটিং শেষ হল, কিন্তু আমার হাঁপানি থামল না। এ ঘটনায় প্রমাণ হয় তখন কতদূর বোকা ছিলাম এবং অভিনয়ের অনেক টেকনিকই জানতাম না। আজ একই ধরনের শটে আমি সহজেই হাঁপিয়ে কথা বলার অভিনয় করতে পারি। তবে ঘটনাতে এটাও নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় যে আমি অনভিজ্ঞ ও বোকা ছিলাম কিন্তু অত্যন্ত সিনসিয়ার ছিলাম। পরে, সন্ধ্যায় মানিকদা ব্যাপারটা জেনেও আমাকে কিছু বলেননি। একজন অভিনেতার সিনসিয়রিটিকে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করতেন, সারাজীবনই।

এ প্রসঙ্গে লরেন্স অলিভিয়ের-এর একটা বিখ্যাত রসিকতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। একজন সহ-অভিনেতা রিয়েলিস্টিক অভিনয় করতে পারছে না দেখে তিনি বলেছিলেন— ‘হোয়াই ডোন্ট ইউ ট্রাই অ্যাক্টিং ফর এ চেঞ্জ।’

বৈরাগ্যতাড়িত অপু সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ে এবং অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। অরণ্যের মধ্যে একটা ফার্নগাছের পাতা হাত দিয়ে ছোঁয়ার একটা স্মরণীয় দৃশ্য ছিল। সেই দৃশ্যের জন্য এবং পাহাড়ের ওপর থেকে পাণ্ডুলিপি ফেলে দেওয়ার দৃশ্যটির জন্য আমাদের নেতারহাট যেতে হয়েছিল। যতদিন বেঁচে থাকব এই নেতারহাট যাওয়ার কথা আমি কখনও ভুলব না।

একটা পরিচ্ছন্ন অরণ্যের সন্ধানে আমরা নেতারহাটে পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার পথে একটা ছোট্ট মজার কথা মনে পড়ে গেল। প্রবল শীত, তখন রাঁচি পর্যন্ত সরাসরি ব্রডগেজ লাইন ছিল না, মুরিতে নেমে যেতে হত। হাওড়ার পর খড়্গপুরে প্রথম ট্রেন থামে বলে সবাই একটু প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘুরে বেড়িয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে নেয়। আমাদের সঙ্গে মানিকদাও প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন। শীতের রাত্রও প্ল্যাটফর্মে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন মানিকদাকে চিনে ফেলে একটা অটোগ্রাফ চাইলেন, মানিকদা তাঁকে একটা সই করে দিলেন। মানিকদার সইটা নিয়ে সেইদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর সেই অটোগ্রাফ-শিকারি বললেন— ‘এবার একটা বাংলায় সই করে দিন।’ মানিকদার সইতে যে একটা ইংরেজির ‘এস’-এর মত আঁকড় আছে সেটাই সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। মানিকদার মধ্যে সহজ, স্বাভাবিক, অথচ তীক্ষ্ণ রসবোধ আমি চিরকাল লক্ষ্য করেছি, ওঁর মত অনন্যব্যক্তিত্বের জন্য বোধহয় এটাও জরুরি ছিল।

নেতারহাটের স্মৃতি বলার আগে আরও একটা মূল্যবান ঘটনার কথা বলা দরকার, অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ঘটনার জন্য এখনও ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি, আমৃত্যু থাকব। সঙ্কের কিছু পরে হাওড়া থেকে ট্রেন ছেড়েছিল এবং ভোরবেলায় মুরি স্টেশন পৌঁছেছিলাম। ফার্স্টক্লাস কামরার একটা কুপেতে আমরা দুজন ছিলাম আর কেউই ছিল না, আমরা সারারাত একটুও না ঘুমিয়ে গল্প করেছিলাম। জীবনের যাবতীয় বিষয় নিয়ে গল্প হয়েছিল, তার মধ্যে বেশিরভাগটাই ছিল সিনেমা নিয়ে। আমি নাছোড়বান্দা বালকের মত ওঁকে প্রশ্ন করে গেছি, উনি এতটুকু বিরক্ত না হয়ে চমৎকারভাবে সব বুঝিয়ে বলেছিলেন। আজ পর্যন্ত সিনেমা সম্পর্কে সামান্য যতটুকু ধারণা, তার অনেকটাই গঠিত হয়েছিল সেই রাতে। মহাকালের অতুলনীয় ঔদার্যে একটা সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের রাত্রি যেন আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। আমার প্রথম দুটি প্রশ্ন ছিল— সিনেমা কী? এই শিল্পমাধ্যমের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী? উনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিয়েছিলেন। শব্দ থেকে বাক্য এবং বাক্য থেকে যেমন সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তেমনি সিনেমারও যে একটা নিজস্ব ভাষা আছে, সিনেমা যে বেসিক্যালি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ শটস্ তা তিনি আমাকে সেই রাতে বুঝিয়েছিলেন। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে জটিলতম শট নেওয়ার কৌশল ও শিল্পময় প্রয়োগ ইত্যাদি পর্যন্ত আমাদের আলোচনা চলেছিল। আলোচনা মানে উনিই শ্রীকৃষ্ণের মত সিনেমা-বিশ্বের অপার রহস্য ব্যাখ্যা করেছিলেন আর আমি ছিলাম একেবারে মুগ্ধ শ্রোতা। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে একটা মোক্ষম প্রশ্ন করেছিলাম। অপার স্নেহ এবং প্রশ্ন না পেলে কেউ এমন ধরনের প্রশ্ন সত্যজিৎ রায়ের মত ব্যক্তিত্বকে করতে পারে না।

শিল্পজগতের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ ছবি আঁকা, লেখা, সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদিতে যথেষ্ট প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মানিকদা কেন সিনেমা করতে এলেন তা নিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম। মানিকদা আমাকে জবাব দিয়েছিলেন— ‘দেখ, আমি যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম তখন একবার আমরা সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছবি আঁকতে গিয়েছিলাম। অজন্তা-ইলোরাও দেখলাম। দেখলাম সাহিত্য ও শিল্পে অসামান্য সৃষ্টি ভারতে ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। কোনও দিকে আর শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে ওঠার তেমন সুযোগ নেই এটা বুঝে ফেলেছিলাম।

সেজন্য আমি এমন একটা শিক্ষামাধ্যম বেছে নিয়েছি যেখানে নতুন কাজ করার জায়গা আছে, আমাদের দেশে সিনেমা নিয়ে এখনও বেশি কিছু হয়নি। সেই জন্যেই সিনেমা করছি।' আজ বুঝতে পারি মানিকদার সেদিনের কথা মূল্য কতটা। মানিকদা সিনেমাকে শুধু পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাঁর নিজের শিল্প-প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে খুব সহজভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন, উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি নিতে হয়নি। এখন বুঝতে পারি, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর প্রথম সিনেমা শুরু করার আগেই তৈরি হয়েছিল। যাই হোক, তাঁর উত্তর শুনে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই রাত্রির স্মৃতি বহুব্যবহারই আমার জীবনে ফিরে ফিরে এসেছে। সেই একটা রাত্রি আমার কাছে কতখানি মূল্যবান তার বাস্তবিক ব্যাখ্যা অনেকবারই পেয়েছি, তার একটার উল্লেখ করি। ১৯৮৬ সালে আমি টেলিভিশনের জন্য এক ঘণ্টার একটা ছবি করেছিলাম। 'স্বপ্নী কা পত্র' ছিল নাম। ছবিটা করতে গিয়ে আমার বারবার সেই রাত্রির কথা মনে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই শিক্ষাই আমি কাজে লাগিয়েছি। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমি ১২৫টা ছবিতে অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু নিজে ছবি-পরিচালনার কাজ করতে গিয়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি চলচ্চিত্রবিষয়ক জ্ঞাননির্ধারক দাঁড়িপাল্লায় একদিকে ১২৫টা ছবির সঙ্গী হওয়া ২৮ বছর, আর অন্যদিকে সেই একটি রাত্রি। স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই, পাল্লা সেই একটি রাত্রির অভিজ্ঞতার দিকেই ঝুঁকেছে। সিনেমায় এমন কোনও বিষয় ছিল না যা সেই রাত্রে আলোচিত হয়নি।

নেতারহাট পৌঁছানোর পর পরের দিন ভোরবেলায় শুটিং হবে। প্রচণ্ড শীত, একটা প্রকাণ্ড বড় ঘরে আমরা শুয়ে আছি। ভোর তিনটেয় উঠে মেকআপে বসেছি। মেকআপ হয়ে গেছে। ভোরবেলায় অরণ্যের ঘুম ভাঙছে, বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলেই সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আস্তে আস্তে আলোর অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। মানিকদা পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হঠাৎ একেবারে শিশুর মত বলে উঠলেন— 'এ যে একেবারে মাস্টারমশায়ের (আচার্য নন্দলাল বসু) ছবি!' মানিকদার সেই অসহ্য আনন্দ প্রকাশ করার ভঙ্গি আমি কখনও ভুলব না।

আরও একটা ঘটনায় আমি মানিকদার চোখে জল দেখেছিলাম, সেটাও

অবিস্মরণীয় স্মৃতি। ‘অপুর সংসার’-এর শুটিং চলছে। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট সত্যেন চট্টোপাধ্যায় জানানেন যে তাঁদের পাড়ার কাছে বেলেঘাটায় ‘চন্দ্রশুপ্ত’ নাটক হবে। ‘চাণক্য’ চরিত্রে অভিনয় করবেন স্বয়ং শিশির ভাদুড়ী। মানিকদা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যাবে নাকি?’ আমি তো পারলে তক্ষুনি চলে যাই। কারণ আমি কাগজে দেখে অভিনয়ের খবর আগেই পেয়েছিলাম। শুটিংয়ের পরে ট্যাক্সি করে মানিকদা আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে তুলে নেবেন এইরকম কথা হল। তখনও ওঁর গাড়ি ছিল না। তখন যুবক মানিকদা, গেক্সা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা মানিকদা বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে তুলে নিলেন। আমি শিশিরকুমারের কাছে গিয়ে জানালাম যে সত্যজিৎবাবু এসেছেন, উনিও সাদরে মানিকদাকে সাজঘরে নিয়ে আসতে বললেন। একটা ক্যাম্প-চেয়ারে শিশিরবাবু, পাশে একটা চৌকি মত, সেখানে মানিকদা বসেছেন। আমি দুজনের মাঝখানে বসে আছি। দুজন বিরাট ব্যক্তিত্বের কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর মানিকদা হঠাৎ বললেন— ‘জানেন, সৌমিত্র আমার ছবিতে ভাল অভিনয় করেছে।’ শিশিরবাবু স্বাভাবিক গলায় বললেন— ‘করারই তো কথা।’ ঠিক সেই মুহূর্তে এক সপ্রতিভ বালক একটা অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রথমেই শিশিরবাবুর অটোগ্রাফ চাইল। শিশিরবাবু অন্যসময় হলে হয়ত একটু বিরক্ত হতেন কিন্তু মানিকদার সামনে কিছু না বলে সই করে দিলেন। মানিকদাকেও সই দিতে হল, তারপর সেই অর্বাচীন বালক আমার স্বাক্ষরও চেয়ে বসল। আমি কোনও কথা না বলে একাগ্রচিত্তে মাটি দেখতে লাগলাম, যেন এর আগে বেলেঘাটার মাটি কখনও দেখিনি। মানিকদা দুইহিমির ভঙ্গিতে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। সেই বালক আচরণে অসম সাহসী। সে কিছুতেই সই না নিয়ে যাবে না। আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে শিশিরবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— ‘কী সৌমিত্র, তোমার কী হয়েছে?’ মানিকদা সহজভঙ্গিতে বললেন— ‘বুঝতে পারছেন না, ও আপনার সামনে সই দিতে লজ্জা পাচ্ছে।’ শিশিরবাবু বললেন— ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও না, তুমিও সই দাও।’ মানিকদাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন— ‘হ্যাঁ, অভ্যেস কর, এরপরে তো দিতেই হবে।’ আমার অবস্থা আমিই বুঝতে পারছিলাম। এই ঘটনার পর আমরা নাটক দেখতে বসে গেলাম। নাটকের সেই দৃশ্য— যেখানে চাণক্য তাঁর হারিয়ে যাওয়া কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরে পেলেন, সেই দৃশ্যে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখে মানিকদার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। নাটক শেষ

হওয়ার পর ট্যান্সি পাওয়ার জন্য আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হল। রাস্তায় অনেকেই মানিকদাকে চিনতে পারলেও বিরক্ত করছিল না। দুজনের কেউই কোনও কথা বলছি না। ট্যান্সি পেয়ে অনেকটা পথ চূপচাপ থাকার পর আমি মৃদুস্বরে মানিকদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মানিকদা, কেমন লাগল?’ মানিকদা প্রচণ্ড উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন— ‘ওফ, কোনও মানুষে এমন অভিনয় করতে পারে?’ প্রকৃতির অবর্ণনীয় রূপ বা মানুষের সৃষ্টি কোনও মহৎ শিল্প এই দুটো বস্তুই যাঁর চোখে জল এনে দেয় তাতে তিনি যে কত বড় সংবেদনশীল মানুষ তা বোঝা যায়। প্রকৃতি বা যে-কোনও মহৎ শিল্প দুটোতেই বিম্বিত হওয়ার ক্ষমতা তাঁর শিল্প-সচেতন হৃদয়ে ছিল। ‘অভিযান’ ছবির শুটিংয়ের সেই মামা-ভাগনে পাহাড় দেখে মানিকদার কী উচ্ছ্বাস! বললেন— ‘কী অদ্ভুত ব্যাপার বল তো? এই পাথরগুলো অদ্ভুতভাবে এখানে এল কী করে? কে আনল?’ একেবারে শিশুর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সত্যিকারের রোমান্টিসিজমের যে সংজ্ঞা আমরা সকলেই পড়েছি, সেই ‘রেনেশী অফ ওয়াস্তার’ একটা অদ্ভুত বিস্ময়বোধ। সেটা একটা শিশুর মধ্যে যেমন থাকে, চারদিকের যাবতীয় বস্তু সে যেন প্রথম দেখল, সেইভাবে রিঅ্যাক্ট করার ক্ষমতা— এই দুর্লভ ব্যাপারটা মানিকদার মধ্যে ছিল। একজন শিল্পীর বিস্ময়বোধ চলে গেলে তার আর কী থাকে? জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানিকদার মধ্যে এই অবাক হতে পারার ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতার জন্যই মানিকদা সারাজীবন তাজা ছিলেন এবং কাজেকর্মে কখনও পুরনো হননি।

## পাঁচ

নিজের কাজের ক্ষেত্রে মানিকদা নাকি কখনও কারও কথা শোনেন না, এ ধরনের কিছু কিছু কথা শোনা যায়। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। ‘অভিযানে’ নরসিংয়ের ভাঙা ভাঙা বাংলা-সংলাপ বলাটা আমি অভিনয়ের আগে থেকেই ভেবেছিলাম। হাওড়ায় স্কুলে পড়ার সময় এরকম কিছু চরিত্রের সৃষ্টি আমার পরিচয় ছিল। তাদের জবানটা এখানে কাজে লাগাব ভেবেছিলাম। আউটডোরে মানিকদা যেদিন প্রথম শুটিং করতে আরম্ভ করলেন তখন মানিকদাকে আমি বললাম, আমি এইরকম হিন্দি-মেশানো

সংলাপ বলতে চাই। উনি সাগ্রহে আমার কথা শুনলেন। তখন ওঁর মুখে রুমাল রেখে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চিবিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন— ‘যা বললে তা খানিকটা করে দেখাও তো।’ আমি করে দেখালাম। উনি বললেন ‘আচ্ছা, তুমি রিহাসাল কর, আমি পরে দেখছি’, বলে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি একটু দ্বিধার মধ্যে থাকলেও রিহাসালের সময় ওই ভাঙা ভাঙা হিন্দিই ব্যবহার করতে লাগলাম। উনি শুনছেন ঠিকই, কিন্তু কিছুই বলছেন না। শেষ পর্যন্ত যখন শট নেওয়া হবে তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম— ‘তাহলে মানিকদা যেভাবে ভাঙা বাংলায় রিহাসাল দিচ্ছিলাম সেইভাবেই কি বলব?’ মানিকদা ক্যামেরার পিছনে, মুখে রুমাল। একটু দুষ্টহাসি হেসে উচ্চারণভঙ্গি বদলে ঠিক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতেই বললেন— ‘সে হামার তো কুছু আপত্তি নেই, খালি ভাবছি গুলাবীর সঙ্গে লাভ সিনগুলো ঠিক কীরকম শুনাবে।’ তারপর বললেন, ‘কর তো দেখি, পরে হাতে তো আমাদের ডাবিং রইল।’ তার পরের দিন থেকে দেখলাম, মানিকদা ডায়লগ শিটের মধ্যে ওই ভাঙা ভাঙা হিন্দিই লিখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নরসিং সেই ভাষাতেই কথা বলেছিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর যদি নিজের থেকে কিছু দেওয়ার থাকে, মানিকদা কিন্তু সেখানে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করতেন না। এর একটাই কারণ, তিনি নিজের অহংবোধের চেয়ে তাঁর কাজকে বেশি ভালবাসতেন। এই সহজ সত্য যাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি দোষটা তাঁদের, পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নয়।

‘অভিযান’ ছবিতে প্রথমে আমার অভিনয় করার কথা ছিল না, মানিকদাও ছবিটা পরিচালনা করবেন তা ভাবেননি। ‘অভিযান’ গল্পটা নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা ছিল প্রযোজক বিজয় চ্যাটার্জি এবং শব্দযন্ত্রী দুর্গা মিত্রর, ওঁদের যৌথ উদ্যোগে ছবি হবে, পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন বিজয়বাবু— এমনই স্থির হয়েছিল। ওঁদের অনুরোধে মানিকদা চিত্রনাট্য লিখে দিলেন। বিজয়বাবুর নরসিং-চরিত্রের জন্য প্রথম-পছন্দ ছিলেন উত্তমকুমার, কিন্তু কোনও কারণে উত্তমদা রাজি না হওয়ায় বিজয়বাবু আমার কাছে আসেন এবং আমি তো তৎক্ষণাৎ রাজি হই।

‘অভিযান’-এর শুটিং হবে, বিজয়বাবু অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বারবার মানিকদাকে শুটিংয়ের দিন স্টুডিওতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানালেন। বিজয়বাবুর অনুরোধ ছাড়াও মানিকদার স্টুডিওতে হাজির থাকার বোধহয়

আরও একটা কারণ ছিল, নিজের লেখা চিত্রনাট্য, অন্যের হাতে পড়ে সেটার কী অবস্থা হবে— এসব নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি মানিকদাকে একটু চিন্তায় ফেলেছিল। শুটিংয়ের প্রথম দিনে মানিকদা উপস্থিত থাকলেন। তাই নয়, ফ্লোর কন্ডাক্ট থেকে শুরু করে শট ডিভিশন পর্যন্ত সবই করলেন। প্রথম দিনের শুটিংয়ে কী শট নেওয়া হয়েছিল তা আমার এখনও মনে আছে, রাস্তায় আমার ‘কেরাইসলার’ গাড়ি নিয়ে ওভারটেক করেছিলাম বলে বীরেশ্বর মুখার্জি আমাকে ধমক দিচ্ছেন, সেই দৃশ্যটার শুটিং হল। ঠিক হল এর পরের শুটিং সবই হবে আউটডোরে, বীরভূমে।

যেদিন আউটডোরে যাওয়ার কথা সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমার কাছে গাড়ি এল না, আমি রীতিমত অবাক। পরে, সেইদিনই একজন এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন যে, ‘আউটডোর সিডিউল’ ক্যানসেল করা হয়েছে, পরে হবে। আমি সেই সময়ের প্রায় দৈনন্দিন কাজ হিসেবে সন্ধ্যার দিকে মানিকদার কাছে গিয়েছি, গিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম— ‘কী ব্যাপার, আউটডোর ক্যানসেলড হল কেন?’ মানিকদা অল্প হেসে বললেন— ‘অনিলবাবু, দুর্গাবাবু ওঁরা বলছেন, ছবিটা আমিই যেন করি। তবে বুঝলে, আমি এখনও ঠিক ডিসাইড করিনি।’ ততদিনে মানিকদার ছবির কাজ-সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ধরন খানিকটা বুঝতে পারি, বুঝলাম মনে মনে অনেকটা ঠিকই করে ফেলেছেন এবং সেইজন্যই ‘আউটডোর’ বাতিল করিয়েছেন। অন্যদের সঙ্গে আমিও মানিকদাকে অনুরোধ করলাম— ‘হ্যাঁ, মানিকদা, আপনিই করুন।’ তারপর মানিকদাই দায়িত্ব নিলেন, নতুন করে প্রোগ্রাম হল এবং আমরা আউটডোরে গেলাম, বীরভূমের হেতমপুরে।

## ছন্ন

‘অপুর সংসার’ শেষ হল, দেশে-বিদেশে অনেক প্রশংসাও পেল ছবিটা। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার যে মূল্যবান প্রাপ্তি তা হচ্ছে মানিকদার সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। পরের ছবি ‘দেবী’।

‘দেবী’-র শুটিং চলার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। ‘জলসান্দর’ যেখানে হয়েছিল, সেই নিমতিতায় ‘দেবী’-র আউটডোর শুটিং চলছে। হয়ত আমার সেই যৌবনের উচ্ছ্বাসের দিনগুলোয় কোনও কারণে মানিকদা আমার আচরণে

একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। ঠিক কারণটা আজ আর আমার মনে নেই। এমনও হতে পারে আমার শৃঙ্খলাবোধে কোথাও সামান্য বিচ্যুতি দেখেছিলেন। সেজন্য, আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কথাগুলো বলেছিলেন। ‘দেবী’-র সেই দৃশ্যের শুটিং হবে, যেখানে শর্মিলা বলবে— ‘আমি দেবী নই’। শুটিং স্পট আমরা যেখানে ছিলাম তার চেয়ে অনেক দূরে, অন্তত মাইলখানেক তো হবেই। শুটিং শুরু হওয়ার অনেক আগেই আমাদের ডায়লগ শিট দিয়ে দেওয়া হত, মানিকদার নির্দেশ মত আমরা ভাল করে তা পড়ে রাখতাম। মুখস্থ করতাম না। উনিই বারণ করতেন। রিহার্সাল দিতে দিতে সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম।

মেকআপ হয়ে গেছে, ক্যামেরাও রেডি, টেকিং হবে। এমন সময় মানিকদা ইউনিটের সকলের সামনেই আমাকে বললেন— ‘সৌমিত্র, ডায়লগ শিটগুলো এনেছ?’ আমি বললাম— ‘না’। উনি বললেন— ‘যাও, নিয়ে এস।’ মেকআপ নিয়ে সেই এক মাইল রাস্তা হেঁটে আমি ডায়লগ শিটগুলো আনতে গেলাম। সেই মুহূর্তে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমার বেশ রাগ হয়েছিল, মনেও লেগেছিল। একজন পেশাদার অভিনেতাকে কাজের সময় নিজেই উজাড় করে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মানিকদা কথাগুলো বলেছিলেন, তা-ও হতে পারে।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মানিকদা ‘তিনকন্যা’ করবেন। ‘তিনকন্যা’র ‘সমাপ্তি’ অংশে আমার কাজ। সেটাও খুব চমৎকার চরিত্র। মূল গল্পে চরিত্রটির নাম ছিল অপূর্ব, আমি আগে একবার অপূর্বকুমার রায় হয়েছিলাম বলে মানিকদা সমাপ্তিতে চরিত্রটির নাম করে দিলেন অমূল্য। নিমতিতাতেই শুটিং হয়েছিল। সেই সময়ের একটি দিনের ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমাপ্তির একটা দৃশ্য টেক করা হবে, সেই পথের কাদায় জুতো আটকে যাওয়ার দৃশ্যটা, কিছুতেই করা যাচ্ছে না কারণ বৃষ্টি লোকেশন ছেড়ে উধাও। পথে কাদা করার জন্য প্রচুর জল ঢালা হল, কিন্তু তৃষ্ণার্ত মাটি জল শুষে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। কাদা দুঃপ্রাপ্য হয়েই রইল। অপেক্ষা করতে করতে একদিন ঝড়সহ বৃষ্টি এল। বেশিক্ষণ ছিল না, ঘণ্টাখানেক, কিন্তু তাতেই কাজ হল। পদ্মার ধারে সেই মনোরম পরিবেশে আমি অবাধ হয়ে দেখলাম মানিকদার কী আশ্চর্য প্রাণশক্তি, কতটা পরিশ্রম উনি করতে পারেন। সমাপ্তির সেই শেষ দৃশ্য, যেখানে অমূল্য মৃন্ময়ীকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে— সেই সমস্ত শটই উনি



এক ঘণ্টার মধ্যে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সময়ে উনি ডকুমেন্টারি ছবি ‘রবীন্দ্রনাথ’-এর কাজও করছিলেন। সেই যে ‘হৃদয় মন্ডিল ডমরু গুরু গুরু...’ গানটার সঙ্গে যতগুলো শট নেওয়ার ছিল তাও নিলেন, সে-সবও ওই এক ঘণ্টার ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই। আমি-সহ ইউনিটের সবাই হতবাক হয়ে মানিকদার সেই সুপার-হিউম্যান এনার্জির পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি ছুটছিলেন, গোটা লোকেশনের নানা প্রান্তে, সবাই তাঁর হুকুমে গতিময় যন্ত্রের মত কাজ করছিল। নিজে অত পরিশ্রম করতেন বলে অন্যরাও করত। ভাল অধিনায়কের মত তিনি নিজে সামনে থেকে লড়তেন। তখন আমি মানিকদার সঙ্গে এতটাই জড়িত যে আমিও ওঁদের সঙ্গে সব ধরনের কাজেই হাত লাগিয়েছিলাম। আমার অভিনয়-অংশ শেষ হওয়ার পরই আমিও মালপত্র নিয়ে ছুটোছুটি করেছিলাম। সমাপ্তির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করে আমার যতটা আনন্দ হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি আনন্দ হয়েছিল সেই এক ঘণ্টার কাজের ঝড়ের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে দিতে পেরে। মানিকদা নিজে পদ্মার একগলা জলে নেমে গিয়ে ক্যামেরা চালিয়েছিলেন। একজন কর্মনিষ্ঠ মানুষ কীভাবে কতটা পরিশ্রম করতে পারে তার প্রমাণ আমি সেদিন পেয়েছিলাম। এই ধরনের জীবন্ত উদাহরণ দেখেই আমি নিজের জীবনে শুধু সিনেমায় অভিনয়টুকু করা ছাড়া অন্য কিছু করারও উৎসাহ পেয়েছি।

## সাত

বাইরের গভীর ঝোলসের মধ্যে এক সরস মানিকদা লুকিয়ে থাকত। চিরকালই কাজের ফাঁকে তাঁর পরিহাসপ্রিয় চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। ‘দেবী’র শুটিং চলার সময়ের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গেল। যেখানে আমি আর অনিল চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার দেখছি, সেই দৃশ্যটা তোলা হবে, আয়োজন চলছে। হঠাৎ বংশী চন্দ্রগুপ্ত আমার হাতটা ধরে মানিকদার দিকে তাকিয়ে বললেন— ‘মানিক, দেখ দেখ সৌমিত্রের হাতটা কী শক্ত।’ মানিকদা কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কাজটা করতে করতেই বললেন— ‘হবেই তো, ও যে এখন বাইরের অনেক ছবিতে প্রচুর লাভ-সিন করছে।’

‘তিনকন্যা’র পরের ছবি ‘অভিযান’। হাসি-ঠাট্টার কথা হচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গই বলি।

‘অভিযান’-এ একটা দৃশ্য আছে, আমি, মানে নরসিং চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেই শেখরদা আমার পায়ে একটা চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে মারবে। তারপর আমি একটু দূরে অন্য একটা দোকানে চা খেতে বসব এবং যোশেফ, মানে জ্ঞানেশদার সঙ্গে আলাপ হবে। মানিকদা বলে দিয়েছিলেন— আমি আর জ্ঞানেশদা যখন কথা বলব তখন যেন আমি মাঝে মাঝে শেখরদাদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে গালাগালি দিতে থাকি।

তখন অল্প বয়স ছিল, মানিকদা গালাগালি দিতে বলেছেন, আমি আর জ্ঞানেশদা মনের সুখে মৃদুস্বরে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, জ্ঞানেশদা চুপ, মাটির দিকে তাকিয়ে আছে, আমি বললাম— ‘কী হল জ্ঞানেশদা? চুপ করে গেলে কেন?’ জ্ঞানেশদা চুপ, কয়েক সেকেন্ড পরে জ্ঞানেশদার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার পিছনেই মানিকদা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি ঘুরে তাকাতেই মানিকদা সেই ভারিগলায় বললেন— ‘হ্যাঁ, গালাগালি দিচ্ছ, দাও, কিন্তু দেখো সেন্সর বাঁচিয়ে।’

এসব কথা মনে পড়লেই মনে হয় মানুষটা কী আশ্চর্য রকম জীবন্ত ছিলেন।

ছোটখাটো মজার কথা কত ছড়িয়ে আছে। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ করতে একবার গেছি জঙ্গলে। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। বৌদি তাড়াহড়ায় মানিকদার ব্যাগে পাজামা দিতে ভুলে গেছেন। যখন ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হল, তখন ডালটনগঞ্জে লোক পাঠিয়ে দর্জির কাছ থেকে নতুন পাজামা করিয়ে আনা যাবে না। আমাদের কারও পাজামা মানিকদার মাপে হবে না। আমি আর মানিকদা একটা বাংলায় ছিলাম। আমার একটা বিশাল বড় বার্মিজ লুঙ্গি ছিল, বললাম— ‘আমার বেশ বড় হয়, বুকের কাছাকাছি, সুতরাং আপনার হয়ে যাবে, আপনি পরবেন?’ মানিকদা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন। অগত্যা ট্রাউজার পরেই ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু ওই গরমে ট্রাউজার পরে বোধহয় ঘুমোতে পারছিলেন না। মধ্যরাতে দেখি মানিকদা, ছোটরা যেমন বড়দের ডাকে সেইরকম প্রায় ভয়ে ভয়ে ডাকছেন— ‘সৌমিত্র! তোমার সেই লুঙ্গিটা আছে?’ আমি হেসে ফেললাম, মানিকদাও। প্রায় অসহায়ের মত বললেন— ‘এ বস্তু কীভাবে পরতে হয়?’ আমি দেখিয়ে দিলাম। পরদিন

সকালে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, মানিকদা উঠে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন, আমি বললাম— ‘শুড মনিং মানিকদা, রাত্রে ঘুম হয়েছিল?’ মানিকদা বললেন— ‘কী করে হবে, লুঙ্গি পরে কারও কখনও ঘুম হয়?’

‘চারুলতা’ নিয়ে বার্লিন গিয়েছিলেন মানিকদা, যতদূর মনে পড়ছে ১৯৬৫ সালে। বার্লিনে গিয়ে আমরা প্রচুর বিদেশি ছবি দেখতাম। শুধু বার্লিন কেন, যখন যেখানে মানিকদার সঙ্গে গিয়েছি সব সময়েই আমাদের চেষ্টা ছিল যত বেশি সম্ভব ছবি দেখব। সেই সময় ইউরোপে প্রধানত সেক্স নিয়ে ছবি করার একেবারে বন্যা বয়ে গিয়েছিল। ছবিগুলোর মধ্যে অধিকাংশ উঁচুমানের না হলেও তাতে টেকনিক্যাল কোয়ালিটি থাকত অবাক হওয়ার মত। একটা ছবির নাম ঠিক এক্ষুনি মনে পড়ছে না, তবে ছবিটা নিয়ে খুব হইহই হয়েছিল। সাধারণত বিদেশে একসঙ্গে গেলে সিনেমা হলে আমাদের বসার অর্ডারটা থাকত এইরকম— বৌদি, মানিকদা তারপর আমি। আমাদের সঙ্গে মানিকদার এক বন্ধুও ছিলেন, তবে তিনি মানিকদার ততখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। আমি সেই ছবিটা দেখার সময় দুটুমি করে সেই বন্ধু ভদ্রলোককে মানিকদার পাশে বসিয়ে দিয়েছিলাম। ছবি শেষ হওয়ার পর হল থেকে বেরিয়ে যেই সেই বন্ধু ভদ্রলোক একটু এগিয়ে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানিকদা আমাকে বললেন— ‘তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই ধরনের একটা ছবি আর তুমি ওঁকে আমার পাশে বসিয়ে দিলে?’

মজার ঘটনার যেন কোনও অন্ত নেই। ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে মানিকদা ছোটখাটো রসিকতা এতই বেশি করতেন যে তাঁদেরও বেশ সতর্ক থাকতে হত।

নিজের ইউনিটের সকলেরই কাজকর্ম ও পরিশ্রমের ক্ষমতা কতটুকু তাও মানিকদা খেয়াল রাখতেন। বীরভূমে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ‘অভিযান’-এর শুটিং হচ্ছে। গরম মানে ১১৪ ডিগ্রি গরম। নরসিংয়ের তিন ঘণ্টা ধরে করা মেকআপ আর সারাদিনের পরিশ্রম, শরীর আর যেন বইছিল না। যে দৃশ্যে আমি রবিকে বলছি গাড়ি চালাতে, সেই দৃশ্যটার কাজ হবে। আমাকে বোধহয় একটু বেশিরকম ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিলবাবু বললেন— ‘সৌমিত্রের খুব কষ্ট হচ্ছে, আজ এখানেই প্যাক-আপ করবেন?’ মানিকদা মুখ ঘুরিয়ে আস্তে বললেন— ‘কষ্ট না করলে কি ভাল অভিনেতা হওয়া যায়?’ আমি কথটা শুনলাম এবং মনে মনে একটু কষ্ট হল।

কলকাতায় ফিরে ইনডোরে শুটিং হচ্ছে। এখানেও প্রচণ্ড গরম। গুলাবীর সঙ্গে প্রেমের দৃশ্য তোলা হবে। নরসিংয়ের ঘরের দৃশ্যের শট নেওয়া হবে,

যেখানে মাঝরাতিরে শুলাবী আসবে। মুখে সেই তিন ঘণ্টার মেকআপ। কাজ করতে করতে সত্যিই আমার মাথাটা হঠাৎ একবার ঘুরে গিয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা রড জাতীয় কিছু ধরে ফেললাম। মানিকদা ব্যাপারটা ঠিক লক্ষ্য করেছিলেন, কাছে এসে বললেন— ‘কী, তোমার শরীর খারাপ লাগছে?’ আমি অভিমানে বললাম— ‘না’। মানিকদা কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন— ‘প্যাক-আপ’।

নিজের ইউনিটের লোকজনদের সম্পর্কে খেয়াল রাখার আরও একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। রাজস্থানে ‘সোনার কেল্লা’র শুটিং চলছে। গাড়িতে যেতে যেতে যেখানে ফেলুদা জটায়ুকে প্রশ্ন করতে বারণ করা সত্ত্বেও জটায়ু কিছুক্ষণ পরপর অদম্য কৌতূহল চাপতে না পেয়ে প্রশ্ন করতে করতে জিজ্ঞাসা করে বসেন— ‘উট কি কাঁটা বেছে খায়?’— সেই দৃশ্যের শুটিং হবে। একটা গাড়ির পিছন দিকে তোপসে মানে সিদ্ধার্থ, সন্তোষদা আর আমি। সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশের জায়গাটায় সিটটা তুলে ফেলে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে মানিকদা, যতদূর মনে পড়ছে পাশে বোধহয় ছিল পূর্ণেন্দু। টেক করা হবে, মানিকদা যেই ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়েছেন তার পরের মুহূর্তে পিছন দিক থেকে মদ্যপায়ী এক ড্রাইভার তার ট্রাক নিয়ে ধাক্কা লাগাল। আর এক মুহূর্ত আগে লাগলে মানিকদার চোখটা নষ্ট হয়ে যেত। ইউনিটের সবাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে মানিকদার কিছু হয়েছে কিনা জানতে। মানিকদা কিন্তু নিজের কথা উপেক্ষা করে আগে আমাদের তিনজনের আলাদা করে খবর নিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, ইউনিটের অন্যরা কিন্তু আমাদের তেমন কিছু খবর নেননি। সেটাই স্বাভাবিক, সবাই মানিকদার খোঁজ নিয়েছে আগে, আমরাও। সারাজীবন বিভিন্ন রকম কাজ ও ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি, মানিকদা আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত মানবিক ছিলেন। রেডিওর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ‘অপূর সংসার’ করতে এসেছিলাম। মানিকদা তার পরেই একবার কথায় কথায় বলেছিলেন— ‘অভিনয়টা তো তুমি করতেই পার, যদি অন্য কোথাও ডাক না পাও তাহলে আমারই অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে থাকবে।’ অর্থাৎ আমি কী করে বেঁচে থাকব সেটাও তিনি ভাবতে চান। ঝড়-ঝাপটা থেকে একটা তরুণ অভিনেতাকে বাঁচিয়ে রাখার যে পিতৃসুলভ আচরণ সেটাই তাঁর মানবিকতার বড় লক্ষণ। অথচ সত্যি কথাটা কী? আমিই তো নিজের আগ্রহে চাকরি ছেড়ে এসেছিলাম, তাতে ওঁর বিন্দুমাত্র দায়িত্ব থাকার কথা নয়।

‘চাকলতা’ করার সময় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার জীবনে ঘটে যায়। রবীন্দ্রযুগের আগের সময়ের হাতের লেখায় অভ্যস্ত করার জন্য আমাকে হাতের লেখা বদলাতে হয়। ক্যালিগ্রাফির জ্ঞান ওঁর থেকে ভাল আর কার থাকতে পারে! পুরনো বাংলা ক্যালিগ্রাফি পুঁথি ইত্যাদির আদল থেকে অমলের হাতের লেখা ঠিক কীরকম হবে তা উনি স্থির করেছিলেন। অনেকেরই মত আমিও আগে রবীন্দ্রনাথের ধারায় যে বাংলা হাতের লেখা হয়, সেই ধাঁচেই লিখতাম। মানিকদা এই ব্যাপারটার জন্য পুঁথি, ফোটো এবং নিজের হাতে সেই রবীন্দ্রপূর্ব যুগের লেখা লিখে আমাকে দিয়েছিলেন, ‘অমল’ চরিত্রের হাতের লেখার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন অভ্যাস করি। এসব ‘চাকলতা’ ছবির গুটিং শুরু করার অনেক আগের ব্যাপার। ফলে হল কী, আমার হাতের লেখাটা সারাজীবনের জন্য বদলে গেল। জীবনে দ্বিতীয়বার হাতেখড়ি হয়েছিল বলতে পারি। এ ধরনের একাধিক কারণে বলতে পারি, মানিকদার কাছে থাকতে পেরে, তাঁর ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে আমি দ্বিজদ্ব অর্জন করেছি। অন্য সব ব্যাপারের মত মানিকদা অনন্যতায় এবং বিশিষ্টতায় বিশ্বাস করতেন, যে নতুন কিছু করছে তার প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মানিকদার কাছাকাছি থাকতে পেরেছিলাম বলে তাঁকে চিঠিপত্র বিশেষ লেখার প্রয়োজন হয়নি, তবুও বিশেষ কোনও কারণে যখন তাঁর কাছে কোনও চিরকুট পাঠাতে হয়েছে, তখনই তিনি আমার সেই বদলে-যাওয়া হাতের লেখার দিকে নজর রেখে রসিকতা করে বলতেন— ‘দেখেছ, তোমার হাতের লেখাটা পাস্টে কেমন সুন্দর হয়েছে।’

মানিকদার সৌজন্যবোধ আরোপিত ছিল না, ওটা ছিল তাঁর ভিতরের জিনিস। সাম্প্রতিক ছবি ‘শাখাপ্রশাখা’তে আমারও একটা ছোট্ট রোল ছিল। আমি যদি অত ছোট ভূমিকায় অভিনয় না করি, যেন সেইভাবে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন যে এই রোলটা ছোট একটা মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের রোল, মুখে হয়ত মাত্র পাঁচশটা ডায়ালগ থাকবে, কিন্তু চরিত্রটা শক্ত— তোমাকে কিন্তু আমার লাগবে। আমি তো মানিকদার কাণ্ড দেখে অবাক। সত্যজিৎ রায় চাইছেন, তাতে আমি কেন, পৃথিবীর যে-কোনও অভিনেতা অভিনয় করে ধন্য হবে। এ প্রসঙ্গে আমার মারলন ব্রাভোর সেই

উত্তর মনে পড়ে যাচ্ছে। চার্লস চ্যাপলিন সোফিয়া লোরেন আর মারলন ব্রান্ডোকে নিয়ে ‘কাউন্টেস ফ্রম হংকং’ করবেন। এই সংবাদ জানার পর স্টিফেন অলিভেয়ার ব্রান্ডোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ‘আপনি কি স্ক্রিপ্ট শুনেছেন?’ ব্রান্ডো প্রশ্ন শুনে বলেছিলেন— ‘চার্লস চ্যাপলিন ছবিতে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন ওটাই তো যথেষ্ট। ওঁর কাছে আবার স্ক্রিপ্ট শুনব কী, উনি যদি টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলে বলেন, এটাই চিত্রনাট্য, আমি সেটাই মেনে নেব।’ ‘শাখা প্রশাখা’-য় অভিনয় সম্পর্কে কেউ কেউ আমাকে কিছু বাড়তি প্রশংসা করেছেন। সবিনয়ে জানাই, এখানেও মানিকদার চিত্রনাট্যেই অধিকাংশ জিনিস লেখা ছিল, মায় টেবিল চাপড়ানো পর্যন্ত। মানিকদা যদি আমাকে সত্যি সত্যিই কোনওদিন এক্সট্রার ভূমিকায় কাজ করাতেন, আমি তাতেও অখুশি হতাম না। সাধারণ পরিচালকরা যেভাবে একজন মোটামুটি ব্যস্ত অভিনেতার সঙ্গে কথা বলেন— সেই অভিনেতার সময় কীরকম খালি আছে, একসঙ্গে কতদিন ফাঁকা আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন, মানিকদাও তাই করতেন। সেখানে উনি যে সত্যজিৎ রায়, এই ব্যাপারটা কখনও দেখাতেন না। এই সৌজন্যবোধ ওঁর বরাবর ছিল।

আমার কোনও রোল থাক আর না থাক, তাঁর সমস্ত চিত্রনাট্য আমাকে শোনাতেন এবং মতামত জানতে চাইতেন। আমিও প্রশ্ন পেয়ে অকুতোভয়ে নিজের মতামত শুনিতে দিতাম। ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এর চিত্রনাট্য শোনার পর আমি গুপীর রোলটা করতে চেয়েছিলাম। আবদার করেছিলাম বলা যায়। মানিকদা হেসে বললেন— ‘না না, এটা তুমি করবে কেন?’ আমি বললাম— ‘আমি ভালই করব, আপনি দেখবেন।’ মানিকদা বললেন— ‘আমি জানি তুমি ভাল করবে, কিন্তু আমার মনের ছবির সঙ্গে মিলছে না যে। তোমাকে গুপী ভাবতে পারছি না। আরও গ্রাম্য চেহারা হওয়া দরকার।’ পরে অবশ্য তপেন এত ভাল করেছিল যে, আমি গিয়ে আর বলতে পারিনি আমি ভাল করতাম।

আমার শেষ নাটক ‘ঘটক বিদায়’ ছাড়া মানিকদা আমার সব নাটক দেখেছেন, অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। তবে ‘নীলকন্ঠ’ নাটক সম্পর্কে মানিকদা যা বলেছেন তাই-ই আমার অভিনেতা-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করি। নীলকন্ঠের প্রযোজকরা গিয়েছিলেন ওঁর কাছে, উনি লিখে দিয়েছিলেন— ‘নীলকন্ঠ নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন।’

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের হাতের মালা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, নীলকণ্ঠ নাটকে অভিনয়ের জন্য মানিকদার মন্তব্য সম্পর্কে আমার অনুভব অনেকটা সেইরকমই— ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এই জীবনে আর প্রত্যাশা করি না।

‘চারুলতা’-র প্রথম চিত্রনাট্য আমাকে প্রথম শোনানোর পর মানিকদা যখন আমার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন একেবারে শেষ দৃশ্যটা তখন যেমন লিখেছিলেন সেটা আমার মনে ধরেনি এটা বলে ফেলেছিলাম। মানিকদা প্রথম যা লিখেছিলেন সেটা এইরকম ছিল— ভূপতি বেরিয়ে গেল ফিটনে চেপে, তারপর ফিরে এল। সংলাপসম্মত একটা ছোট্ট দৃশ্য ছিল। চারু বেরিয়ে আসছে, ভূপতি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, চারু বলছে— ‘চল, ঘরে চল।’ তখন ভূপতি বলছে— ‘ঘর কি আর সে ঘর আছে?’ তখন চারু হাতটা বাড়িয়ে দেবে, হাতটা ধরে দুজনে আস্তে আস্তে ঢুকবে।

শেষটা শুনে আমার কীরকম যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল, কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না। মানিকদা জিজ্ঞাসা করলেন— ‘বল, কেমন লাগল?’ আমি বললাম— ‘গল্পে যেমন আছে, ‘চারু কহিল না, থাক’ তাতে যে ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির ধাক্কা আছে, এখানে যেন সেটা পাচ্ছি না।’ এর বেশি কিছু তো মানিকদাকে বলাও যায় না। মানিকদা বললেন— ‘না, এ ছাড়া তো আমি আর কোনও শেষ খুঁজে পাচ্ছি না। তখনকার দিনে তো ডিভোর্স ছিল না, তাহলে কী করত তারা? নিশ্চয়ই ওইরকম ট্রাজেডির পরেও একসঙ্গে বসবাস করেছিল।’ আমার প্রথম অপছন্দের কথা সহজভাবেই বেরিয়ে এসেছিল, খানিকটা জোর পেয়ে আমি বললাম— ‘না, মানিকদা ট্রাজেডির ধাক্কাটা যেন শেষে পাচ্ছি না।’ মানিকদা তবুও বললেন— ‘কী জানি, আমি তো এ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।’ আমি আর কী বলব, অন্য গল্পগাছা করে বাড়ি চলে এলাম। তখন প্রায় রোজই মানিকদার বাড়িতে যেতাম, পরের দিন গিয়েছি। মানিকদা আমাকে দেখেই খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ডাকলেন— ‘শোন, আমি কাল শেষটা পাশ্টেছি।’ বলে এখন আমরা যে ফর্মে চারুলতা দেখি সেইটা বললেন— চারু ও ভূপতি দুজনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, চারু বাতি নিয়ে যাচ্ছে— দুজনেই আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু দুটো হাত পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে স্থির নিশ্চল হয়ে যায় স্টিল শট। পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে সব। সময় যেন গতিহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার শুনেই দারুণ লাগল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। ওই স্টিল শটের ব্রিলিয়ান্ট সিনেমাটিক

ইউজ দারুণ লেগেছিল। আমার ভাবতে ভাল লাগে, হয়ত চারুলতার শেষ দৃশ্য নতুন করে লেখার ক্ষেত্রে আমার একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। মানিকদাও একেবারে শিশুর উল্লাসে বলেছিলেন— ‘বল, এবারে ভাল হয়নি?’

সত্যজিৎ রায় নিজে যত্নে, পরিশ্রমে চিত্রনাট্য লিখেছেন তার উৎকর্ষ কি অন্য কারও শোনার ওপর নির্ভরশীল ছিল? অবশ্যই না। কিন্তু উনি শোনাতেন, প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেন। অত্যন্ত আন্তরিক আগ্রহেই অন্যের কথা শুনতেন। সেখানে তাঁর নিজের অহঙ্কার, খ্যাতি বা অপরিস্রব সাফল্য বাধা হয়ে দাঁড়াত না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই রকমই। নিজের লেখা চিত্রনাট্য বারবার বদলাতেন। ‘ঘরে বাইরে’ ছবির চিত্রনাট্য কতবার বদলেছেন তার হিসেব রাখা কঠিন। একজন মানুষ নিজে নিজের কাজের সমালোচক না হতে পারলে এত যত্নবান হওয়া যায় না। শেষ সময়ে, মানে যখন ছবিটার গুটিং শুরু করতে চলেছেন, সেই সময়েই ‘ঘরে বাইরে’-র চিত্রনাট্য তিনবার লিখেছিলেন। ‘শাখা প্রশাখা’র চিত্রনাট্যেও একাধিকবার নতুন করে লেখা অংশ আছে।

‘কাপুরুষ’ ছবির সময় পরিচালক হিসেবে মানিকদার কাজের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম, তিনি নিজেই ‘ক্যামেরা অপারেশন’ শুরু করলেন। খুব স্বাভাবিক কাজ হিসেবে তিনি আগেও বিভিন্ন সময়ে ক্যামেরায় চোখ রাখতেন, কিন্তু ‘কাপুরুষ’ ছবিতেই প্রথম উনি নিজে পুরো কাজটা করতে শুরু করেছিলেন। অনেক শটে ‘জুম লেন্স’ ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে আছে। ‘জুম’ এর আগে ‘চারুলতা’ ছবিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু ‘কাপুরুষ’-এ জুমের যাকে বলে ‘এক্সটেনসিভ ইউজ’ তা দেখতে পেয়েছিলাম।

একই সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করতে থাকলে যে-কোনও মানুষের সঙ্গেই একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে অন্যের মেজাজ, চিন্তাধারা, রুচি—সবই বেশ খানিকটা বুঝে ফেলেন। তার ওপর যদি সত্যিকারের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে সঙ্কোচের ছোটখাটো পাঁচিলও অদৃশ্য হয়ে যায়। মানিকদার সঙ্গে আন্তরিক প্রীতির সম্পর্কে আমি যে ক্রমাগত লাভবান হয়েছি, সেকথা না লিখলেও সকলে অনুমান করতে পারবেন।

অতবড় একজন মানুষ যখন হঠাৎ খুব সহজভঙ্গিতে কিছু বলেন, তখন একটা মৃদু ধাক্কা তো লাগেই।



একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। ‘কাপুরুষ’ ছবিতে সেই তিস্তা নদীর ধারে পিকনিকের পথে জিপে করে যাওয়ার দৃশ্য টেক করা হবে। তোড়জোড় চলছে। সবাই ব্যস্ত, মানিকদা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বললেন— ‘সৌমিত্র, এই সিন্চুয়েশনের উপযুক্ত রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন বল তো, গুনগুন করবে মাধবী, মানে গাইতে গাইতে যাবে।’ আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম— ‘এ পথে আমি যে গেছি বারবার।’ মানিকদা বললেন— ‘হুঁ, ঠিক আছে।’ তারপর মাধবীর দিকে ফিরে বললেন— ‘তুমি গানটা জানো তো? এই গানটার সুরই গুনগুন করবে।’

নয়

১৯৬৪-তে ‘কাপুরুষ’ ছাড়া আমি আরও একটা উল্লেখযোগ্য ছবিতে কাজ করেছিলাম। সেই ছবি, অর্থাৎ ‘বাস্তবদল’-এর পরিচালনা মানিকদা করেননি ঠিকই, কিন্তু ছবিটাতে মানিকদার অনেক সহায়তা ছিল। পরিচালনা করেছিল নিতাই, অর্থাৎ মানিকদার সহকারী নিত্যানন্দ দত্ত। চিত্রনাট্য লেখা ছাড়া ছবিটার ইনডোর শুটিংয়ের সময় অধিকাংশ দিন মানিকদা ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন। নিশ্চয়ই নিতাইয়ের অনুরোধে মানিকদা আসতেন, কিন্তু আমরা সকলেই মানিকদার উপস্থিতিতে খুশি ছিলাম। খুশির কারণ বোঝা খুব সহজ। মানিকদা ফ্লোরে থাকা মানেই কাজটা ভাল হওয়া, ইউনিটের সকলেই বাড়তি উৎসাহে কাজটা করেছিলেন।

আরও একটা কথা সরাসরিই বলা ভাল। নিজের সহকারী নিতাইয়ের ছবি এবং পরিচালকের আন্তরিক অনুরোধ— শুধু এই দুটি কারণের জন্যই মানিকদা ‘বাস্তবদল’ ছবির শুটিংয়ের সময় ফ্লোরে আসতেন, তা নয়। আসল কথা হচ্ছে নিজের লেখা চিত্রনাট্য কাউকে দিয়ে মানিকদা খুব একটা নিশ্চিত বোধ করতেন না, যেন এক ধরনের অস্বস্তি তাঁকে তাড়া করত, ভাবতেন চিত্রনাট্য ঠিকমত এক্সিকিউটেড হচ্ছে কিনা।

‘বাস্তবদল’ ছবিতে প্রসাদদার অসামান্য অভিনয়ের কথা মনে পড়ছে। ছোট্ট অথচ স্মরণীয় চরিত্র। একজন মনোরোগীর ভূমিকায় কাজ করেছিলেন

প্রসাদদা, ছবিটা য়াঁরা দেখেছেন তাঁদের হয়ত মনে পড়বে। হরেনবাবু অর্থাৎ প্রসাদদার মুখে সংলাপ ছিল এইরকম—

‘...কিন্তু ক’দিন থেকে আবার চোখের সামনে সেই স্পটগুলো দেখছি। আর একটা Swimming sensation— আর গায়ে একটা চিটপিটে ভাব— যেন অজস্র পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে কামড়াচ্ছে। বুয়েছেন কিনা।’

অভিনয় প্রসাদদা খুবই ভাল করেছিলেন একথা ঠিকই, কিন্তু গোটা দৃশ্যের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন মানিকদা। আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে, ফ্লোরে মানিকদা প্রসাদদাকে ঠিক একইভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসাদদার যেটা নিজস্ব গুণপনা, তা হচ্ছে তিনি মানিকদার দেখিয়ে দেওয়া ভঙ্গিটা একেবারে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করেছিলেন। আমরা সকলেই সেই দৃশ্যে প্রসাদদার অভিনয় উপভোগ করেছিলাম।

‘বাস্তবদল’ ছবিতে আরও একজনের অভিনয়ের স্মৃতিও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বুলবুলদা (সতীন্দ্র ভট্টাচার্য) ছবিটাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চমৎকার কাজ করেছেন। বুলবুলদা প্রথম থেকেই মানিকদার চিত্রনাট্যে লেখা চরিত্রের নিজস্ব চেহারাটা ধরতে পেরেছিলেন। স্টুডিওর ফ্লোরে শুটিংয়ের শুরুতে মানিকদা অবশ্যই ‘শোভনলাল’ চরিত্রের অভিনেতা সতীন্দ্র ভট্টাচার্যকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু আউটডোরে, যেখানে মানিকদা ছিলেন না, সেখানেও বুলবুলদা তাঁর অভিনয়ে সুন্দর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। আর একটি পার্শ্বচরিত্রে (রত্না) গীতালি রায়ের কাজও খুব ভাল হয়েছিল। ‘বাস্তবদল’-এ মানিকদার লেখা সংলাপ ছিল যেমন মজার, তেমনই অর্থবহ।

‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’-এর পরে মানিকদার ছবিতে অনেকদিন কাজ করিনি, মানে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯— এই সময়ের মধ্যে মানিকদা যে-সব ছবি করেছেন তাতে আমার কোনও কাজ ছিল না। তাঁর ছবিতে কাজ করছি না মানে যে যোগাযোগ ছিল না তা নয়। আড্ডাপর্ব নিয়মিতই চালু ছিল। যথারীতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরের ছবি ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’।

পালামৌয়ের বেতলা জঙ্গলের নানান জায়গায় আমাদের শুটিং হয়েছিল। আমাদেরই এক বন্ধু, তাঁর নাম মোহন বিশ্বাস, তিনি ছিলেন সেখানকার ফরেস্ট কন্সট্রাক্টর। তাঁর আপিস-কাছারি সমেত বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল।

জঙ্গলের মধ্যেই চিপাদর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই ছিল মোহনবাবুর অফিস ও কাছারি বাড়ি, আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল সেখানেই। গভীর জঙ্গলের একটা প্রান্ত, জায়গাটায় একটা রেল স্টেশনও আছে, রাঁচি—বর্গাখানা লাইনে পড়ে। শুটিং শেষ করার জন্য আমাদের বেশ কয়েকবার সেখানে যেতে হয়েছিল। একটা বাংলায় ছিলাম আমি আর মানিকদা, অন্য শিল্পীরা, অর্থাৎ রবি, শমিত ও শুভেন্দু ছিল আর একটা বাংলায়। সেখানে পালিতদেরও দুটো বাংলা ছিল, তার একটায় ছিল শর্মিলা। অন্য শিল্পীরা ফরেষ্ট রেস্ট হাউস ও অন্যান্য বাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন।

শুটিংয়ের পর অনেক সময় রাত্তিরে আমরা আশপাশের গ্রামে আদিবাসীদের নাচ দেখতে যেতাম এবং তাদের নাচের দলে ঢুকে পড়ে তাদের সঙ্গে নাচতামও। সবাই মিলে হইহই করে দিন-রাত কাটত। মানিকদা অবশ্য কখনও আমাদের হুম্মোড়ে যোগ দিতেন না। তবে পরদিন সকালে চায়ের আসরে বা ঘুম থেকে উঠে দেখা হলে হেসে প্রশ্ন করতেন— ‘কী, কত রাতে ফিরলে?’ ইত্যাদি। তখন প্রচণ্ড গরম, আমরা সকলেই বাইরে খাটিয়ায় শুয়ে থাকতাম। কিন্তু মানিকদা কখনও বাংলোর ঘরের বাইরে ঘুমোননি।

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবিতেই মানিকদা সেই বিখ্যাত ‘মেমারি-গেম’ ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে বাংলা ছবিতে এ জাতীয় মজার খেলা ব্যবহার করা হয়নি। সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ছে, যেখানে আমরা, অর্থাৎ ছবির প্রায় সমস্ত চরিত্র গোল হয়ে বসে আছি। দৃশ্যটার শুটিংয়ে মানিকদা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। ছবি তৈরির প্রতিটি পর্বে মানিকদার মত একজন উঁচুমানের পরিচালক নিজেকে জড়িয়ে রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানিকদার কাছে ব্যাপারটা তার চেয়েও বেশি। নিজের পছন্দমত কোনও জায়গা থেকে শট নেওয়ার জন্য ধুলো, কাদা, জল কিছুই মানতেন না মানিকদা, প্রয়োজনে তাঁকে যেখানে-সেখানে বসে বা শুয়ে পড়তে দেখেছি। সেই মুহূর্তে ঠিক কোথায় শুয়ে পড়ছেন সে ব্যাপারে মানিকদার কোনও ইশাই থাকত না। কিন্তু যে শটটার কথা বলছি, সেটা মানিকদা নিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে, একেবারে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। মেমারি-গেমের সেই দৃশ্যে মানিকদা নিজে ক্যামেরা ৩৬০ ডিগ্রি প্যান করিয়ে একটা অবিস্মরণীয় শট নিয়েছিলেন, অর্থাৎ ক্যামেরা, গোল হয়ে বসা আমাদের সকলের মুখ ধরছে এক জায়গায় স্থির থেকে নিজে ঘুরে ঘুরে। মাটিতে কেউ একজন বসে

থাকলে তার মুখ মাটি থেকে যত উঁচুতে থাকে সেই উচ্চতায় ক্যামেরাকে রাখা হল। কিন্তু ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে বসে বসে তো সে শট নেওয়া অসাধ্য ছিল, কেননা ক্যামেরার ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরার সঙ্গে অপারেটরকেও তো ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। মানিকদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একেবারে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুমান-শক্তির ওপর নির্ভর করে ক্যামেরা ঘুরিয়েছিলেন। একটা মুখকে ধরে রেখে সেই চরিত্রের সংলাপ শেষ হওয়ার পর ক্যামেরাটা প্যান করে আর-একটা মুখ ধরেছিলেন। একজন উঁচুমানের চিত্রশিল্পী ছিলেন বলেই হয়ত এক্ষেত্রে তাঁর ঝানিকটা বাড়তি সুবিধা হয়েছিল। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র কাজ শেষ হওয়ার পর এডিট করার সময় দেখে অবাক হয়েছিলাম যে সেই ৩৬০ ডিগ্রির শটটাতে প্রতিটি চরিত্রের মুখ একেবারে নিখুঁতভাবে ফ্রেমে ধরা হয়েছে। তারপর থেকে আমি যতবার ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ দেখেছি, ততবারই সেই মেমারি-গেমের দৃশ্যটার নিখুঁত টেকিং-এ অবাক হয়েছি।

‘মেমারি-গেম’ খেলার সময় আমরা অরণ্যের মধ্যেই মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রকৃতির নিজস্ব মেজাজের খেলা, কারও প্রভাব সেখানে খাটছিল না। প্রথমে ছায়ায় শট নেওয়া শুরু হয়েছিল বলে মানিকদা পরের শটগুলো মেঘের ছায়াতেই নেবেন বলে অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর রোদ্দুর এসে সব ভুল করে দিচ্ছিল। সবাই প্রস্তুত, শুধু মেঘেরই সময়জ্ঞান নেই। মানিকদা-সহ গোটা ইউনিটের সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি, কিছুই করার নেই।

বিচিত্র বিষয়ে মানিকদার জ্ঞান, পড়াশোনা ইত্যাদির পরিচয় তো বহুকাল আগেই পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে একজন বুদ্ধিদীপ্ত, রসিক ও অবসরে আড্ডাপ্রিয় মানুষের দেখা পেতে এই সব আউটডোর শুটিংয়ের প্রয়োজন হত। সময় কাটাতে হবে, কী করা যায়? মানিকদাই মুশকিল আসান করে দিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন— ‘তোমরা কেউ ‘টুয়েন্টি কোশ্চেনস’-এর খেলাটা জানো?’ আমি যে জানতাম না সেটা বললাম। মানিকদা তখন খেলাটা আমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

কেউ মনে মনে একটা কোনও নাম বা কোনও কিছুর কথা ভাববে, তারপর অন্য একজন পরপর কুড়িটা প্রশ্ন করে তার হৃদিস বার করে ফেলবে। কোনও কিছু ভাবার মধ্যে নয়, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নই আসল ব্যাপার।

মানিকদা প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— ‘সৌমিত্র, তুমি একটা কিছু ভাব।’ আমি প্রশ্নকর্তাকে সমস্যায় ফেলার জন্য মনে মনে প্রাগৈতিহাসিক পাখি ‘টেরোডাকটিল’-এর কথা ভাবলাম। মানিকদা আমাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, উত্তরে শুধু ‘হ্যাঁ’, বা ‘না’ বলার কথা, তাই-ই বলছিলাম। কুড়িটা প্রশ্ন করার দরকার হল না, আঠারোটা প্রশ্নতেই মানিকদা নির্ভুল উত্তর বলে দিয়েছিলেন। মানিকদা প্রচুর ইন্ডোর গেমস জানতেন। দাবা, তাস, স্কেবল ইত্যাদি অনেক ধরনের খেলায় তাঁর আগ্রহ ছিল। একজন মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বের মধ্যেই তার সত্যিকারের পরিচয় লুকিয়ে থাকে, সেদিক থেকে মানিকদা শুধুই একজন প্রতিভাবান নন, প্রকৃত অর্থে একজন সজীব ও রসিক মানুষ ছিলেন, কখনও পুরনো হননি।

## দশ

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবির শুটিংয়ে আমাদের যে বেশ কয়েকবার পালামৌ যেতে হয়েছিল তা আগেই বলেছি। একবার আমি অন্য ছবির কাজের জন্য ইউনিটের সঙ্গে যেতে পারিনি। একদিন পরে কলকাতা থেকে ট্রেনে রাঁচি এক্সপ্রেস ধরে রাঁচি পৌঁছব, এমন কথা ছিল, কিন্তু স্ট্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের বিখ্যাত ট্র্যাফিক জ্যাম অতিক্রম করে যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখন রাঁচি এক্সপ্রেস রওনা হয়ে গেছে। আবার যানজট ঠেলে রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে ছবির প্রযোজককে জানালাম যে আমি গাড়ি ধরতে পারিনি, পরের দিন সকালে রাঁচি উড়ে যাওয়ার জন্য টিকিটের বন্দোবস্ত যেন অবশ্যই করা হয়। তেমনই বন্দোবস্ত হল, সেই ফ্লাইটে ছিলেন ছবির অন্যতম নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর এবং আমাদের সেই বন্ধু মোহন বিশ্বাস।

বর্ষার মেঘ, এলোমেলো হাওয়া— রাঁচিতে গিয়ে প্লেন নামতেই পারল না। শেষ পর্যন্ত আমরা পাটনায় গিয়ে নামলাম। পাটনা থেকে গাড়ি ভাড়া করে বহু বন্যাপ্রাবিত জায়গা পেরিয়ে ও এড়িয়ে আমরা যখন চিপাদরে পৌঁছলাম তখন বিকেল, প্রহর শেষের আলো পড়েছে অরণ্যের ওপর। সারা রাত্তায় মনের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি ছিল, তার কারণ দুপুরে, লাঞ্চার আগেই পৌঁছনোর কথা ছিল, নিশ্চয়ই মানিকদা-সহ গোটা ইউনিটের সবাই

আমারই জন্য অপেক্ষা করছেন— এই চিন্তা আমাকে খোঁচা দিচ্ছিল। দুপুরের পরই শুটিং শুরু করার কথা ছিল, শর্মিলার অবশ্য সেদিন কোনও কাজ ছিল না। চিপাদরে পৌঁছে দেখি, মানিকদা সত্যিই ক্যামেরা রেডি করে অপেক্ষা করছেন, যদি আমি পৌঁছে যাই। আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে মানিকদাকে জানালাম যে, যানজটের জন্য ট্রেন ধরতে পারিনি, রাঁচির প্লেন গিয়ে নামল পাটনায় এবং তারপর গাড়ি। মানিকদা আমার কথা যেন ভাল করে শুনলেনই না। প্রবল উৎসাহে বললেন— ‘এসে গেছ, তা তুমি এখন শট দিতে পারবে? শরীর ঠিক আছে তো?’ আমি ‘হ্যাঁ’ বলতেই মানিকদা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলেন। আমার কোনও মেকআপ ছিল না, শুধু জামাকাপড় বদলে নিয়েই শুটিং শুরু হল। সে এক অদ্ভুত উন্মাদনা। শুধু আমি নই, মানিকদার সঙ্গে যাঁরাই সেই সময়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই বলতে পারবেন আমরা সবাই কী অদম্য উৎসাহে তখন কাজ করতাম। এবং সমস্ত উৎসাহেরই উৎস ছিলেন স্বয়ং মানিকদা। সেদিন প্রথমেই সেই বিখ্যাত মজার দৃশ্যটার শুটিং হল, যেখানে চার বন্ধুর মধ্যে একজন অরণ্যের পশ্চাৎপটে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে বলছে—

‘Sunset!...এরকম sunset কোথায় দেখা যায় বল তো?’ জবাবে আর একজন বন্ধু বলছে— ‘পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায়, কলকাতায় তো বটেই।’ প্রথমে যে বন্ধু প্রশ্ন শুরু করেছিল সে এবার অন্য একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করছে— ‘Western বইয়ে; নারে হরি?’ সঙ্গে সঙ্গে হরির গভীর উত্তর— ‘Burt Lancaster-এর একটা বইয়ে ছিল।’

চিপাদরের অরণ্য এবং তার পরিবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছিল। ওখানে একটা জায়গা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। একটা রাস্তা অরণ্যের দিক থেকে এসে ট্রেনলাইনের ওপর দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। কেন জানি না, পরবর্তীকালে মনে হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটার স্মৃতি শুধু আমার নয়, মানিকদার মনেও থেকে গিয়েছিল। তবে এটা নিতান্তই আমার চিন্তা, সত্যি নাও হতে পারে। একটা কারণের জন্য চিপাদরের সেই রাস্তা-রেললাইন-ব্রিজ ইত্যাদির প্রসঙ্গ মনে এল। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবি করার পরে মানিকদা ‘সন্দেশ’ পত্রিকার জন্য একটা গল্প লিখেছিলেন, গল্পটার নাম ‘রতনবাবু আর সেই লোকটা’, একইরকম দেখতে দুজন মানুষ, বেড়াতে বেরিয়ে দুজনের দেখা, তারপর একজন আর একজনকে একটা উঁচু ব্রিজ

থেকে রেললাইনের ওপর ফেলে দেয়। গল্পটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের রাস্তা-ব্রিজ-ট্রেনলাইন ইত্যাদির যা-যা বর্ণনা আছে সবই চিপাদের সেই রাস্তা-ব্রিজ-রেললাইনের সঙ্গে মিলে যায়। মানিকদার দেখার চোখটা ছিল প্রকৃত অর্থেই অসাধারণ। আউটডোরে যেখানে যত শুটিং করেছি, তা সে যে ছবিরই হোক না কেন, গোটা ইউনিটের কারও কখনও মনে হয়নি যে লোকেশন নির্বাচনে মানিকদা ভুল করেছেন।

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র পরে মানিকদার যে ছবিটিতে কাজ করেছিলাম সেটি ‘অশনি সংকেত’। ‘ঘরে বাইরে’-র মত ‘অশনি সংকেত’ ছবিটিও বহুদিন আগেই হওয়ার কথা ছিল। মানিকদা বহুবার ছবিটি করার কথা ভেবেছেন, আমাদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবিটি শুরু হয়নি। বস্তুতপক্ষে তখন মানিকদার ঘরে নানা কথা নিয়ে আড্ডা চলতে চলতে একটা প্রসঙ্গ বারবার ফিরে আসত— পরের ছবি কী হবে, কোন ছবিটার কাজ শিগগিরই শুরু হবে ইত্যাদি। ‘অশনি সংকেত’ যখন শেষ পর্যন্ত শুরু হল তার অনেক আগে মানিকদার সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল, তার কিছু কিছু মনে পড়ছে। মানিকদা বলেছিলেন— ‘উপন্যাসটা এত সুন্দর যেন চিত্রনাট্য করাই আছে। কীভাবে দুর্ভিক্ষ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার চমৎকার ছবি তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রথম না খেতে পেয়ে মৃত্যুতে কাহিনী শেষ।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন— ‘তাছাড়া গঙ্গাচরণ তো আমাদের হাতেই রয়েছে, খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান।’

‘অশনি সংকেত’-এর গঙ্গাচরণকে নিয়ে আমার একটা নিজস্ব প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। উপন্যাসে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা নদীয়া জেলার ভাষা। ছোটবেলায় কৃষ্ণনগরে থেকেছি, সুতরাং নদীয়ার ভাষা কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু ছোটবেলার সেই দিনগুলোর পর দীর্ঘকাল কলকাতায় কেটেছে। মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে যাই, গ্রামে আউটডোর শুটিং থাকে, কিন্তু তাতে তেমনভাবে গ্রাম দেখা হয়ে ওঠে না। বীরভূমের যে গ্রামে শুটিং হবে সেখানকার লোকজন, তাদের চলাফেরা ইত্যাদি দেখার ইচ্ছে নিয়ে আমি মানিকদাকে বলেছিলাম— ‘আপনি যখন এরপর লোকেশনে যাবেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।’ সাধারণত অভিনেতারা আগে থেকে লোকেশনে যান না, অন্তত বাংলা ছবিতে এ-সবের তেমন রেওয়াজ নেই। মানিকদা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন এবং বললেন— ‘ভালই হবে, ওখানে

গিয়ে লোকেশনের ব্যাকগ্রাউন্ডে কয়েকটা টেস্টও নেওয়া যাবে।' তারপর আমি, মানিকদা, রায় (সৌমেন্দু রায়) এবং ইউনিটের প্রোডাকশন ম্যানেজার বীরভূমের সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। মানিকদা লোকেশনে পৌঁছে চারপাশটা খুব ভাল করে দেখে নিতেন, এটা ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যাস। পরে কাজ শুরু করে কোথাও বিন্দুমাত্র অসুবিধেয় পড়তেন না, কারণ তখন কোথায় কী আছে সবই তো তাঁর জানা। বিভিন্ন গ্রামে ঘোরার সময় আমি একটা নোটবুকে বিভিন্ন ধরনের নোটস নিয়েছিলাম। গ্রামের লোকের কমন ম্যানারিজম কী, কীভাবে গা চুলকোয়, কীভাবে হাঁটে, কীভাবে কাঁধে গামছা রাখে, কীভাবে উবু হয়ে বসে ইত্যাদি আমি লিখে রেখেছিলাম। মানিকদা স্বাভাবিকভাবেই গোটা ব্যাপারটা জানতেন, আমার কাজে তিনি যে শুধু উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই-ই নয়, মনে হয়েছিল আমার কাজের ও প্রস্তুতির পদ্ধতিতে খুশিই হয়েছিলেন।

'অশনি সংকেত'-এর লোকেশনে মানিকদা গঙ্গাচরণের কয়েকটা ক্যামেরা টেস্ট নিলেন, সেখানে কিন্তু আমার মুখে গৌফ ছিল না। আমিই মানিকদাকে বলেছিলাম যে গ্রামের পুরুতবামুনদের অধিকাংশের মুখে কোনও রকমের গৌফদাড়ি থাকে না। একেবারে পরিষ্কার করে কামানো থাকে। কলকাতায় ফিরে মানিকদা স্থির করলেন যে গঙ্গাচরণের মুখে গৌফ থাকবে। আমি একটা মৃদু প্রতিবাদের স্বরে মানিকদাকে বললাম— 'মানিকদা, গৌফটা কেন জানি না আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।' মানিকদা হেসে বললেন— 'কিন্তু গৌফটা থাকবে, তা না হলে তোমার মুখটাকে যথেষ্ট পাল্টে দেওয়া যাচ্ছে না।' আমিও পরে ভেবে দেখলাম মানিকদা ঠিকই বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমার লম্বা লম্বা চুলও ছোট করে কেটে ফেললাম।

ছোটখাটো নানা ধরনের প্রশ্নে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানিকদার সঙ্গে আমার মতের মিলই হত, মতপার্থক্য ঘটেছে খুবই কম ক্ষেত্রে। কারণ তাঁর বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রতি আমার অসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল।

'অশনি সংকেত'-এর সময় মানিকদা আমাকে খুব একটা বেশি নির্দেশ দিতেন না, আমাদের বোঝাপড়া তখন এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে বহুবার উল্লেখ করা ঘটনাটা আবার বলছি। দুর্ভিক্ষ প্রায় শুরু হয়েই গেছে এমন পরিস্থিতিতে গঙ্গাচরণও চালের খোঁজে ব্যাকুল। গ্রামের জোতদার বিশ্বাসমশাই মার খাওয়ার পর গঙ্গাচরণ



তার বাড়ি গিয়েছে, অসুস্থ বিশ্বাসমশাই তার চিকিৎসার জন্য পশ্চিমমুখি অর্থাৎ গঙ্গাচরণকে অনুরোধ করছে এবং প্রতিদানে লুকোনো ভাণ্ডার থেকে চাল দেওয়ার জন্য মেয়েকে নির্দেশ দিচ্ছে। গ্রামের মুখ মানুষের তুলনায় গঙ্গাচরণ অনেক চালাক, রিহাসালের সময় আমি মুখে একটা সামান্য ধূর্ত হাসি রেখেছিলাম। শটটা টেক করার ঠিক আগে মানিকদা আমাকে বললেন— ‘সৌমিত্র, হাসিটা মুখে রেখ না, একেবারে আনকন্সার্নড ভাব দেখাও।’ বলাই বাহুল্য, ওই ছোট্ট নির্দেশটুকু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ গঙ্গাচরণের মুখে হাসিটা না থাকলে তার ধূর্তামিটা আরও বেশি প্রকাশ পায়। রিহাসালের সময় আমি যে হাসিটা রেখেছিলাম সেটা এতই ক্ষীণ যে তা সেই সময় মানিকদা ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করেছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। তবে বারবারই যে কথা লিখছি, মানিকদার চোখে সমস্ত কিছুই ধরা পড়ত, সবই। অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করার সময় মানিকদা তাঁদের নিজস্ব ভাবনার মূল্য দিতেন, যদি অবশ্য সে ভাবনা ছবি সম্পর্কে তাঁর সমগ্র ধ্যানধারণার সঙ্গে বিবাদী না হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কোনও বাঁধাধরা ছক ছিল না, গৌড়ামিও ছিল না। যখন যেভাবে যার কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল কাজ পাবেন, সেইভাবে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। রিহাসাল বা শুটিংয়ের সময় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেননি কখনও, কাউকে প্রায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন, আবার কাউকে একেবারে পুতুলের মত ব্যবহার করেছেন। তাঁর নির্দেশ ও প্রশংসা দুটোই ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চেহারার, সেখানে বেশি শব্দ কখনও ব্যবহার করতেন না।

‘অশনি সংকেত’ ছবিরই আর একটি শটের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। সেটাও ওই চাল চাইবার দৃশ্য। এক বাড়িতে গিয়েছি চাল চাইতে, একজন মহিলা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন, চাল দেবেন। তারপর যখন চালটা পাচ্ছি তখন সেই দিকে আমার লোভাতুর দৃষ্টি, যেন চাল পাওয়াতেই আমার জিভে জল এসে গেছে, ক্যামেরা আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে, ক্রোজ-আপের সময় আমি নিজের বোধবুদ্ধি অনুযায়ী পরিস্থিতির পক্ষে স্বাভাবিক মনে করে ছোট্ট করে একটা ঢোক গিলেছিলাম। মানিকদার চোখ ছিল ক্যামেরায়। শটটা শেষ হওয়ার পরই মানিকদা আমার দিকে ফিরে বললেন ‘এক্সপ্লেস্ট’।

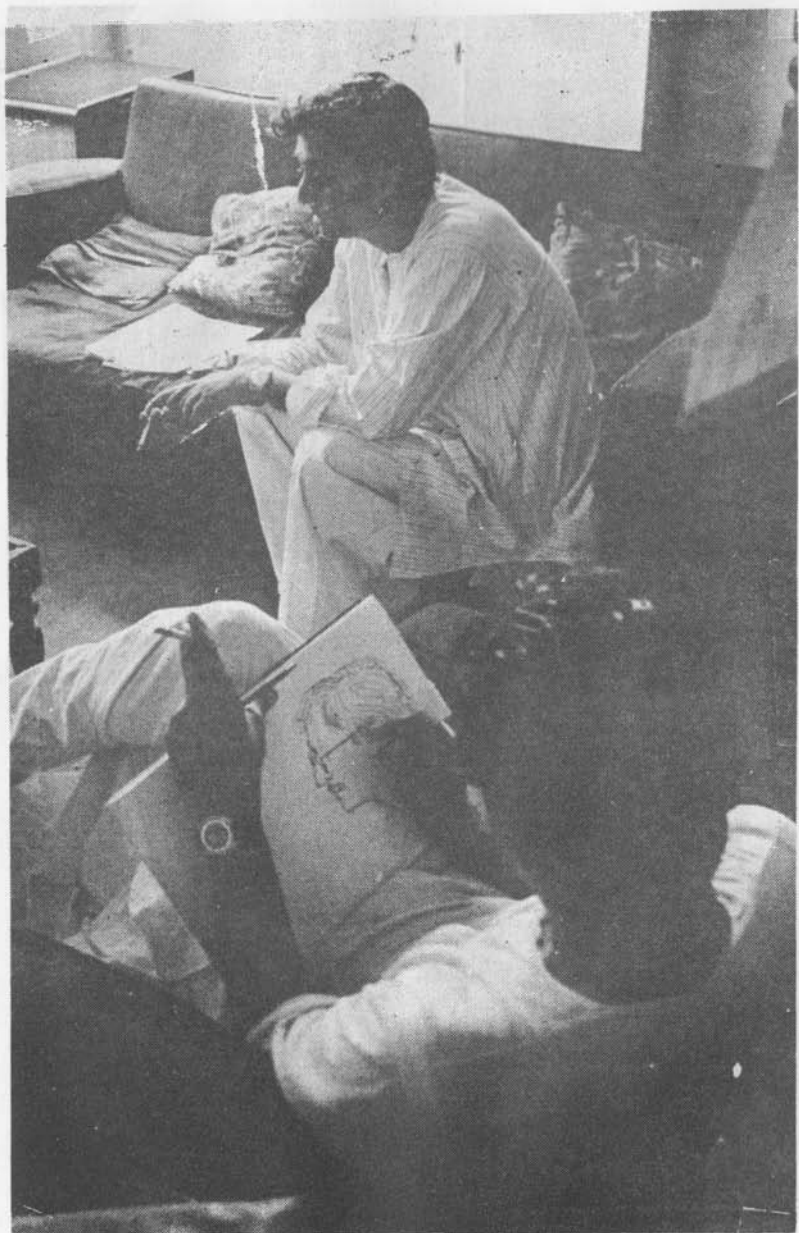
যে গ্রামে শুটিং হয়েছিল, সেখানে গঙ্গাচরণের বাড়ি হিসেবে একটা মাটির কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়েছিল। ছবির কাজ শেষ হলে সেই বাড়িটা গ্রামকেই দিয়ে আসা হয়েছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি, সেখানে কিছু শাক-সবজির গাছ থাকাই স্বাভাবিক, সেজন্য সেখানে সেগুলো লাগানো হয়েছিল। গঙ্গাচরণ সেদিকে তাকিয়ে দেখছে। চিত্রনাট্যে ছিল না, কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে একটা সংলাপ প্রয়োজন, মানিকদা আমাকে এ নিয়ে একটা সংলাপ তৈরি করে বলতে বললেন, আমি বললাম— ‘বাঃ, এই ক’দিনে বেশ শাঁসে-জলে হয়েছে’, মানিকদা সেটা গ্রহণ করেছিলেন। এসব নিতান্তই ছোটখাটো ঘটনা, কিন্তু এতে উৎসাহ যেমন পেতাম, আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যেত।

## এগার

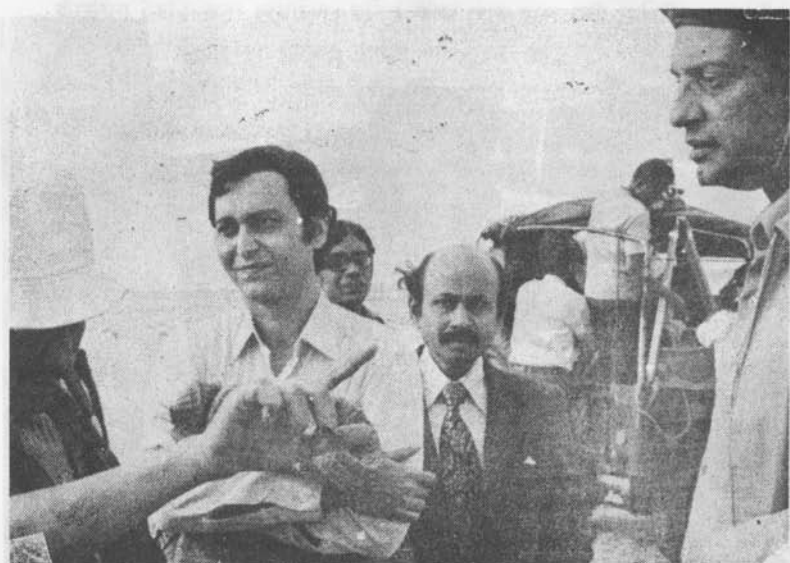
‘অশনি সংকেত’-এর পর আমরা সবাই একটা দারুণ আনন্দময় ছবির কাজ শুরু করলাম, ছবিটার নাম ‘সোনার কেপ্লা’। নিজের লেখা গোয়েন্দা-কাহিনীর গোয়েন্দা ‘ফেলু’ চরিত্রে অভিনয় করতে হবে জানালেন মানিকদা।

যতদূর মনে পড়ছে ফেলুদার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ‘সন্দেশ’ পত্রিকার নবপর্যায়ে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে। ‘সন্দেশ’-এর জন্য গল্প লিখতে গিয়ে মানিকদার চিন্তায় হাজির দলবল সমেত ফেলু মিত্তির। গল্পগুলো যখন প্রকাশিত হল, অন্য সকলের মত আমিও প্রবল আগ্রহে পড়ে ফেললাম। ‘বাদশাহী আংটি’ নামে ফেলুদাকে নিয়ে যে প্রথম রহস্য উপন্যাসটি লিখেছিলেন সেটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল, বিশেষ করে উপন্যাসের শেষপর্বে যেখানে চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে পালানোর ব্যাপারটা ছিল, তাতে খুবই মজা পেয়েছিলাম। ‘বাদশাহী আংটি’ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু ফেলুর কাহিনী নিয়ে ছবি করার চিন্তা-ভাবনা বোধহয় তখনও তেমন করে মানিকদার মাথায় আসেনি।

মানিকদা নিজে তখন কিছু প্রকাশ করেননি, সেজন্য আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে মানিকদা তখনই ফেলুকে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন, না ভাবেননি। তবে আমি ভেবেছিলাম এবং ভাবতাম। আমার ভাবনার কারণ ফেলু-কাহিনীর নিজস্ব আবেদন। এত সুন্দর সাজানো গল্প, পরিবেশ ও



'অশনি সংকেত'-এ গঙ্গাচরণের মেকআপ স্কেচ করছেন মানিকদা, আমাকে সামনে বসিয়ে



'সোনার কেলা'-র লোকেশন, রাজস্থানে



'অপুর সংসার'-এর লোকেশন, স্বরূপগঞ্জে, মানিকদার বা পাশে ভানু ঘোষ, সুব্রত মিত্র ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত



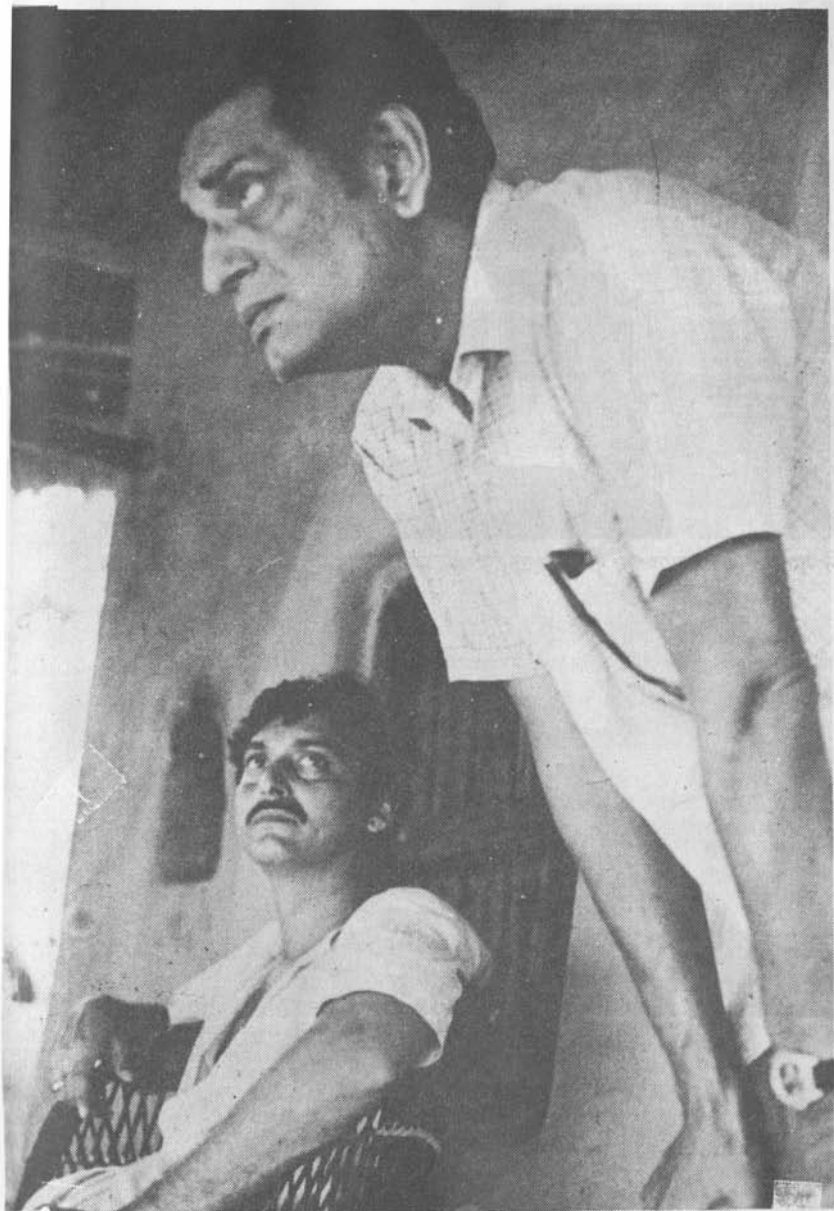
'সোনার কেলা'-র সেট-এ



মেকআপ টেস্ট — 'অশনি সংকেত'-এর আগে

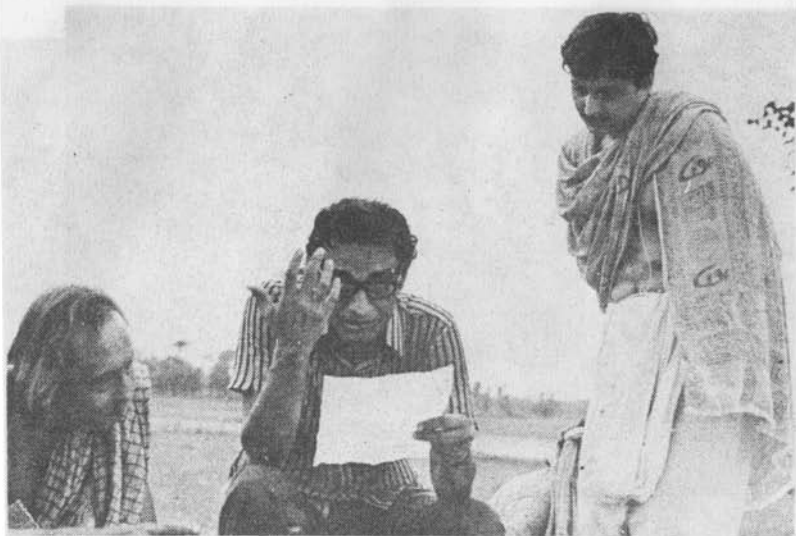


‘অশনি সংকেত’-এর জন্য নেওয়া মেকআপ টেস্ট, লোকেশন-এ নিমাই ঘোষ



‘অশনি সংকেত’-এর লোকেশনে ক্যামেরা বসানোর আগে

নিমাই ঘোষ



'অশনি সংকেত'-এর লোকেশন, দৃশ্যটি পড়ে দিচ্ছেন মানিকদা

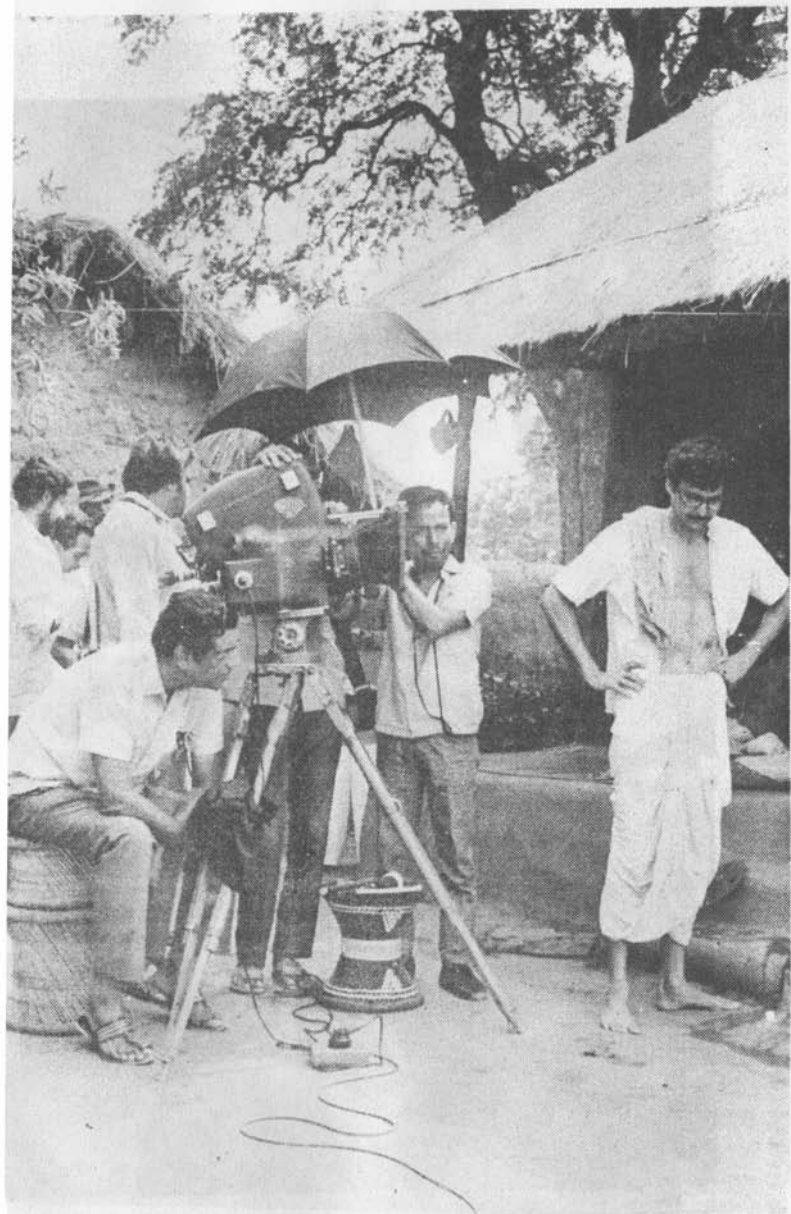
নিমাই ঘোষ



'অশনি সংকেত'-এর লোকেশনে, দৃশ্যগ্রহণের আগে

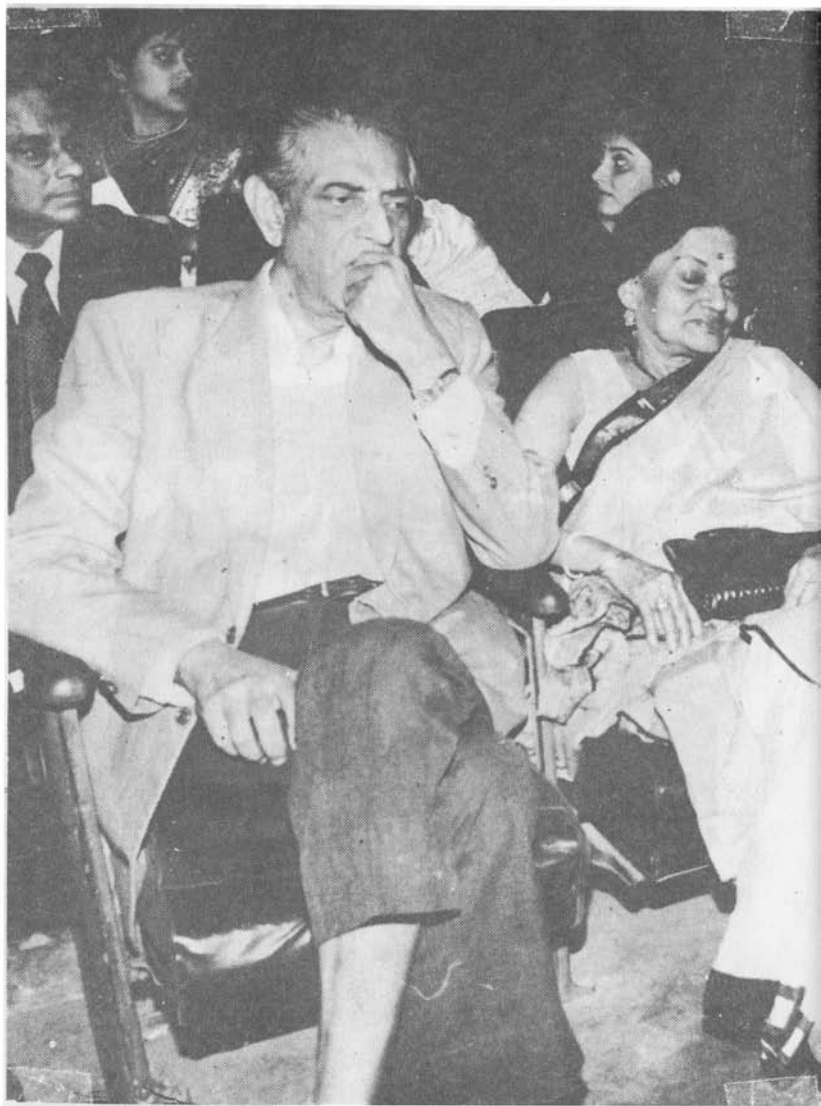
সন্তোষ ঘোষ





‘অশনি সংকেত’-এর লোকেশন, বীরভূমে

সন্তোষ ঘোষ



কলকাতার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ



অশোক চন্দ্র



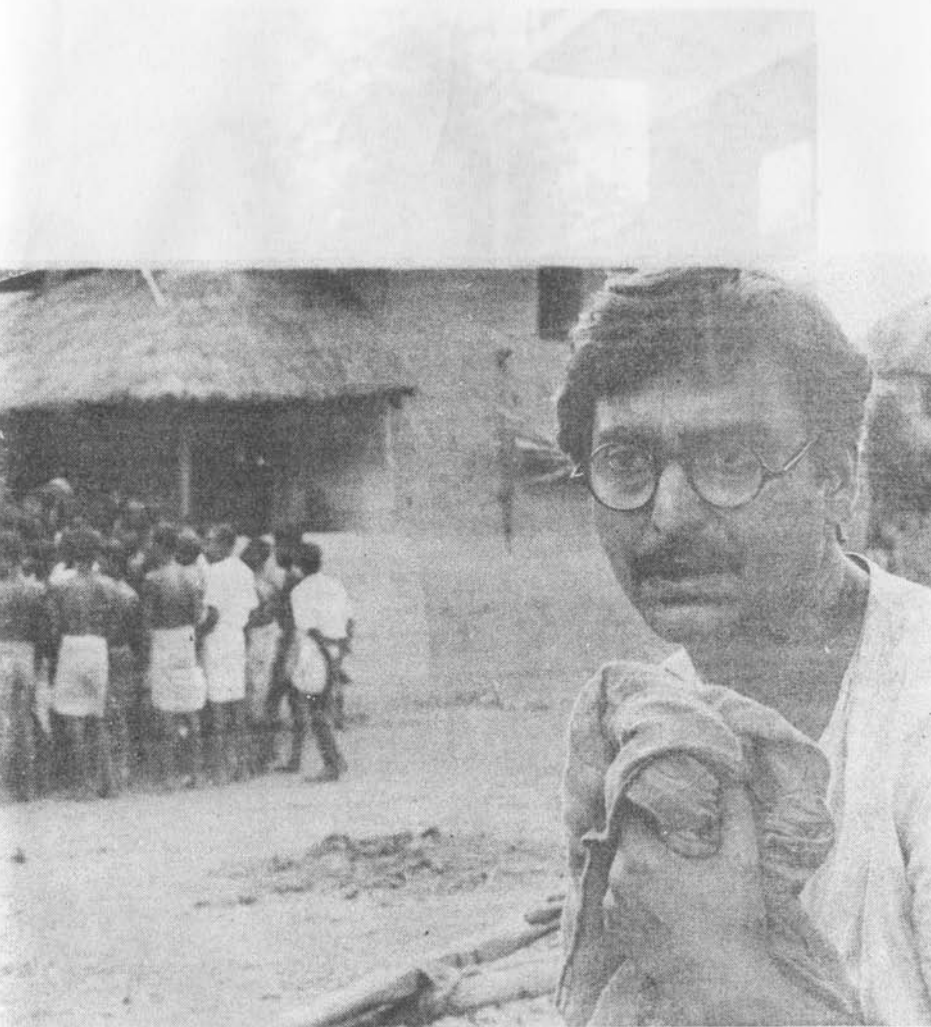
‘অশনি সংকেত’-এর লোকেশনে নির্দেশ দিচ্ছেন মানিকদা

নিমাই ঘোষ

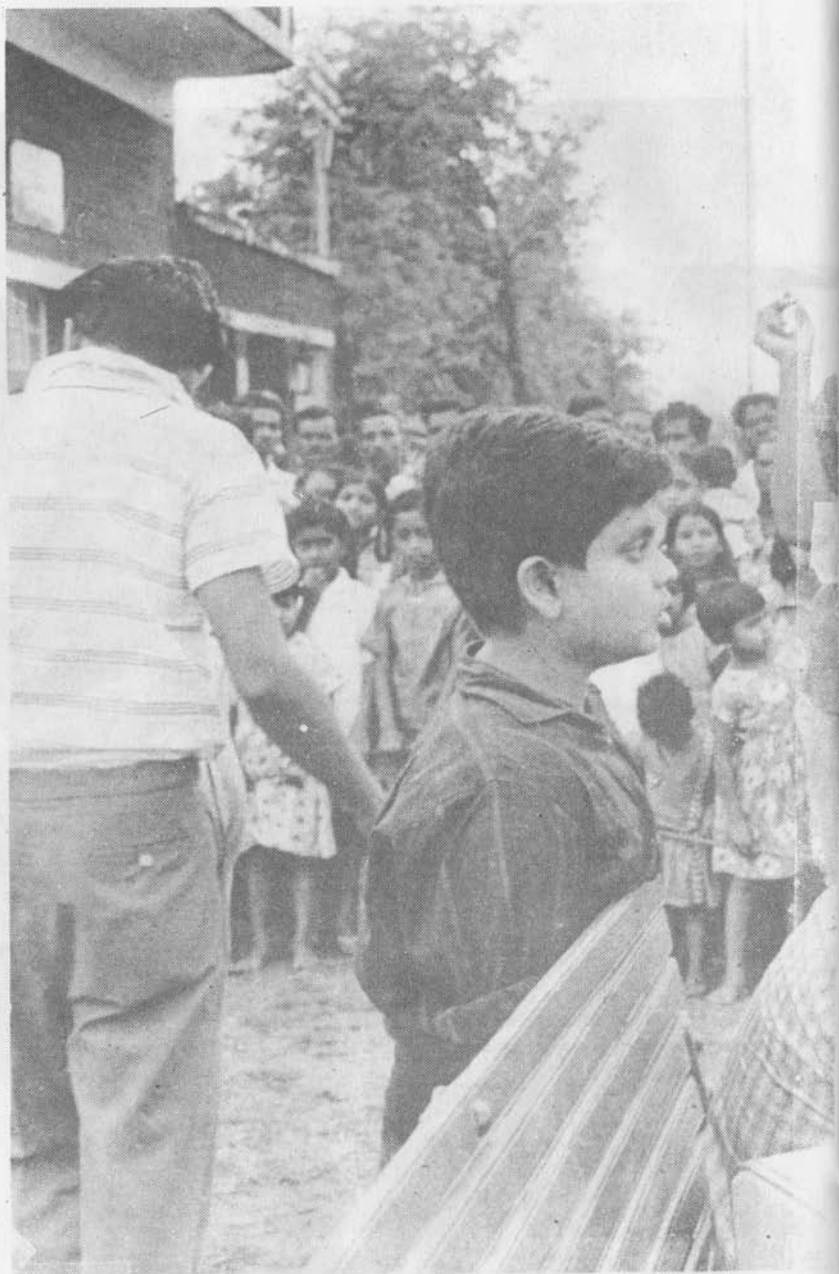


অশনী সংকেত, ববিতা ও আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন মানিকদা

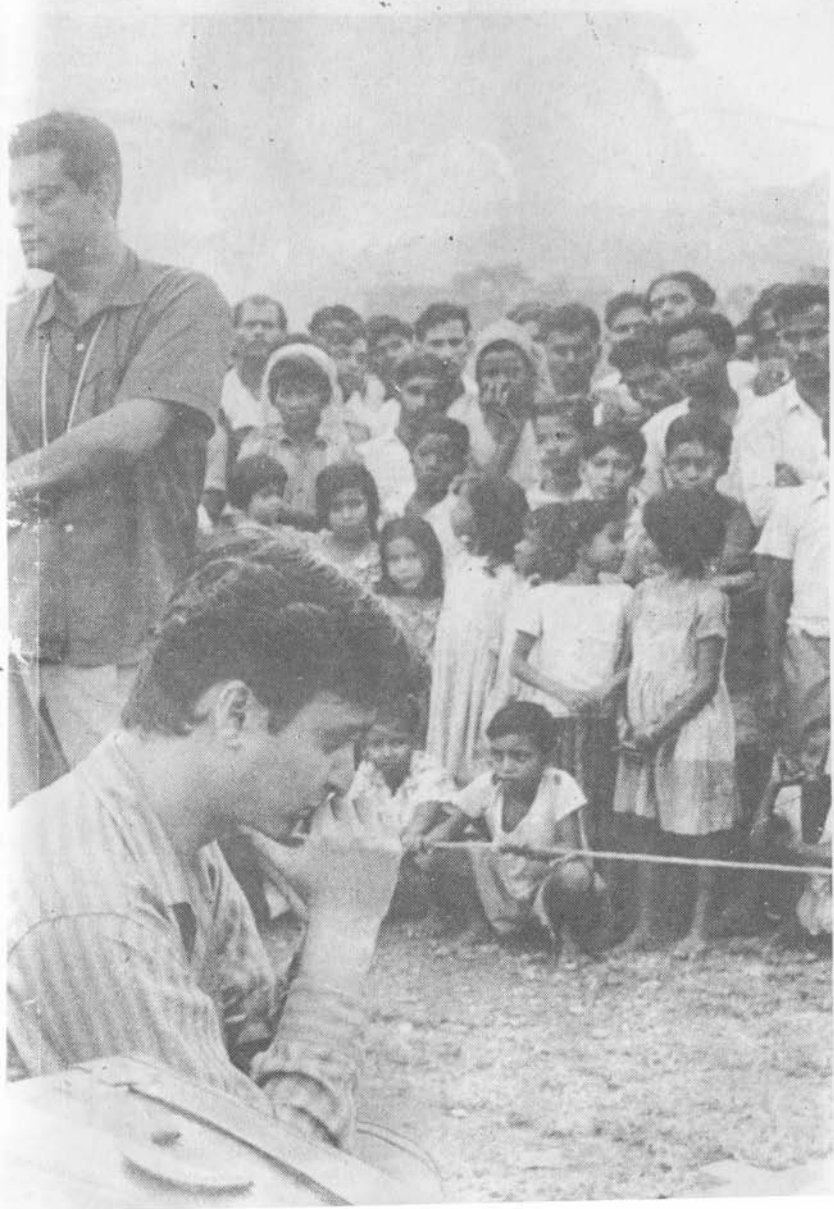
মোনা চৌধুরী



‘অশনি সংকেত’-এ চাল লুণ্ঠের দৃশ্য



‘কাপুরুষ’-এর লোকেশনে, ডুয়ার্সে, সঙ্গে সন্দীপ







‘সোনার কেদা’-র লোকেশনে, জয়পুর স্টেশনে







গন্ধগ্রীনের বাড়িতে পৌলমী দীপা, আমি ও মানিকদা



গন্ধগ্রীনের বাড়িতে মানিকদা ও বৌদির সঙ্গে দীপা, সৌগত, পৌলমী

পরিস্থিতির পরিবর্তন (যা গল্পের নিজস্ব টানেই উপস্থিত), নানা ধরনের চরিত্র, তাদের কথাবার্তা— সব মিলিয়ে মনে হত যেন লেখক স্বয়ং চিত্রনাট্য লেখার কাজটা ইচ্ছে করে খানিকটা এগিয়ে রেখেছেন; এখন চিত্রনাট্য লেখা শুরু করলেই হয়। কাহিনীগুলোর মধ্যে ভ্রমণপর্ব এমন আকর্ষণীয়ভাবে হাজির যেন পাঠকও বিছানাপত্র নিয়ে তোপসে, লালমোহনবাবু এবং ফেলু মিস্ত্রিরের সঙ্গী হয়ে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত যখন মানিকদা ফেলু-কাহিনী নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তা আমার কাছে একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ল। ‘সোনার কেপ্লা’ তৈরির সময় আমার নিজের ছেলে ও মেয়ে কিশোর-কিশোরী, তাদের জন্য আলাদা করে কোনও চরিত্রে অভিনয় করার কোনও ধরনের সুযোগ পেতাম না। ‘সোনার কেপ্লা’র ফেলু চরিত্র ছেলে-মেয়ের জন্যই করছি— এমন একটা ভাবনা আমাকে তখন খুব খুশি করেছিল। ‘সোনার কেপ্লা’ তৈরির সিদ্ধান্তে আমিই কেবল খুশি হয়েছিলাম বললে ভুল হবে, ছবিটার সঙ্গে জড়িত থাকা প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়েছিলেন। ‘সোনার কেপ্লার’ আউটডোর শুটিংয়ের স্মৃতি কেউই ভুলতে পারবেন না।

সিনেমার ফেলুদার আগে বই বা পত্রিকার জন্য আঁকা ফেলুদাকে নিয়ে মানিকদার সঙ্গে কিছু মজার কথা হয়েছিল। ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’ প্রকাশিত হওয়ার পরে একদিন আমি তা নিয়ে কথা বলতে বলতে মানিকদাকে বলেছিলাম, আপনার ফেলুর ইলাস্ট্রেশনগুলো দেখে মনে হয় খানিকটা আপনারই মত। শুনে মানিকদা তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গিতে হেসে ভারিগলায় বলেছিলেন— ‘সে কী! আমায় যে অনেকে বলে গেল আমি নাকি একেবারে তোমার মত করে আঁকছি।’ ফেলু-কাহিনীতে ফেলুর ছবি নিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে, অনেকেরই মতে ছবিগুলো নাকি অনেকটা আমারই মত দেখতে। জানি না, তবে আমার নিজস্ব মত ছবিগুলো বেশ খানিকটা মানিকদার মত, হতে পারে কোথাও কোথাও খানিকটা আমার মত করেই আঁকেছেন; আসলে বোধহয় দুটো চেহারার আদলই রয়েছে ওর মধ্যে। মানিকদার তীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন যে, তিনি সামান্য রসিকতাও ভুলতেন না। ফেলু মিস্ত্রিকে যখন উপন্যাসের পাতা থেকে স্টুডিও বা আউটডোরে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনও মানিকদা ইলাস্ট্রেশন নিয়ে রসিকতার ব্যাপারটা ভোলেননি, নিজেই মনে করিয়ে দিয়ে হেসেছিলেন।

মানিকদা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমার এই ধারণার ব অনেকবারই বলেছি এবং লিখেছি; যেহেতু এ বিশ্লেষণ আমার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য, সেজন্য আরও একবার এ কথা লেখা ছাড়া উপায় নেই। ফেলুদা এবং প্রফেসর শঙ্কু— বাংলা সাহিত্যের এই দুই জনপ্রিয় চরিত্র আসলে সত্যজিৎ রায়ের নিজের চরিত্রেরই দুটি পৃথক প্রতিফলন। মানিকদাকে খুব কম সময় ধরে দেখিনি, পঁয়ত্রিশ বছর সময় দীর্ঘ জীবনের ক্ষেত্রেও বেশ একটা বড় অংশ। মানিকদার মধ্যে একটা দূরন্ত জ্ঞানপিপাসা, বিচিত্র বিষয়ে প্রবল আগ্রহের উপস্থিতি আমি লক্ষ্য করেছি। এমনিতেই তাঁর বিরাট পড়াশোনা ছিল এ কথা তো সবাই জানেন। প্রায় নিয়মিত আলাপ-আলোচনায় বেরিয়ে আসত তিনি কত কী জানতেন।

প্রতিনিয়ত নতুন বিষয় সম্পর্কে আরও জানার একটা তীব্র কৌতূহল তাঁর মধ্যে কাজ করত। অপরিমেয় পরিশ্রম করার ক্ষমতার সঙ্গে মিশেছিল আন্তরিক আগ্রহ। ফেলু-কাহিনী বা প্রফেসর শঙ্কুর অবাক-করা কাহিনীগুলোতে তাঁর চরিত্রের এই গুণগুলো প্রতিভাসিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়। মানিকদার এই অনেক বিষয় জানার ব্যাপারটা শুধু লেখার মধ্যে আছে তা নয়, আছে তাঁর তৈরি সিনেমাতেও। ‘আগন্তুক’ ছবিতেও এই বিচিত্র বিষয়ে জানার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রের জানার ইচ্ছেটাকে যদি ‘এনসাইক্লোপিডিক কিউরিওসিটি’—এই দুই ভারি শব্দ চাপা দিয়ে ছোট করে আনি তাহলে বলতে হবে, ওঁর মত একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মনের দুটো জানালা হচ্ছে ফেলু মিস্ত্রি এবং প্রফেসর শঙ্কু। বড় বাড়ি যখন, তখন তো আরও কিছু জানালা থাকবেই। আর একটা বিশেষ জানালা হচ্ছে ফেলু-কাহিনীর আর একটা চমৎকার চরিত্র, তিনি হলেন ‘সিধু জ্যাঠা’। বলা যায় সত্যজিৎ রায়ের কৌতূহলী মানসিকতার একটা বিশেষ সংস্করণ হলেন এই সিধু জ্যাঠা। শুধু খবরের কাগজে প্রকাশিত খবর সংগ্রহের ব্যাপারেই তিনি অদ্বিতীয় নন, সেইসঙ্গে অসম্ভব স্মৃতিশক্তি, কবে-কোথায়-কীভাবে-কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে খবর তা সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেবেন বা মুখে বলে দেবেন সিধু জ্যাঠা।

তবে প্রকৃত অর্থে সিধু জ্যাঠা হলেন ‘ইনফরমেশন ব্যাঙ্ক’। কিন্তু ইনফরমেশন যেখানে নলেজ হয়ে ওঠে, তার জীবন্ত উদাহরণ হল ফেলু

মিস্তির এবং প্রফেসর শঙ্কু। এদের বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ ও কথাবার্তার পিছনে অদৃশ্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। বাঙালি পাঠকের এ-সত্য বুঝতে কখনও অসুবিধে হয়েছে বলে মনে হয় না। তথ্য পাওয়ার পর তা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে এবং চিন্তাশক্তিতে পরপর সাজিয়ে নেওয়ার কাজটা করেছে ফেলু মিস্তির। বিশ্লেষণের জন্য গোয়েন্দা-কাহিনীতে কখনও কখনও বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকার দরকার হয়। নানা তথ্য ও নানা বিষয়ের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত রহস্য উন্মোচনের কাজে লাগে, গল্পের শেষপর্বে পাঠক নিজেই তা পরিষ্কার বুঝতে পারেন।

ট্রাজেডি বা কমেডির মত সেন্স অফ হিউমারও একজন মানুষের চরিত্রের মধ্যেই থাকে, উপযুক্ত মুহূর্তে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে যে এক পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস ছিল তা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই অনুভব করতে পেরেছিলাম। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে একজন লেখক তো তাঁর জীবনবোধ থেকেই লেখেন। সত্যজিৎ রায়ের গভীর জীবনবোধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বৈচিত্র্য এবং কৌতুকরসের অমর উদাহরণ হয়ে থাকবে ‘জটায়ু’ চরিত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু দুজন জটায়ু আছে, যিনি সিনিয়র, তিনি রামায়ণে। আর দ্বিতীয়জন ফেলু-কাহিনীতে। জটায়ু দুজন হলেও জটায়ু চরিত্রের অভিনেতা সন্তোষ দত্ত ছিলেন অদ্বিতীয়। সন্তোষদা সম্পর্কে কিছু কথা আলাদা করে বলতে হবে, আপাতত ফেলু মিস্তিরকে নিয়ে কথা হোক।

জটায়ুর মত ফেলুও বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যে একটু আলাদা ধরনের বিশেষ চরিত্র। ফেলু রহস্যের জাল ছিঁড়ে সত্যকে আবিষ্কার করে প্রধানত তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়েই, এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা আশ্চর্য ইন্টেলেক্ট যা-ই বলি না কেন, তা ব্যবহার করার আরও উদাহরণ কিন্তু বাংলা সাহিত্যেই আছে, যেমন— ব্যোমকেশ। কিন্তু ফেলু সে অর্থে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীই নয়, তার মধ্যে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চারপ্রীতি, দুর্জয় সাহসের পরিচয় রয়েছে। ‘সোনার কেপ্লা’ ছবিতেই কিন্তু মানিকদা ফেলুর চরিত্রের এই পশ্চাৎপট বলে দিয়েছিলেন। একটা দৃশ্যে ফেলু সম্পর্কে তপেশের বাবা বলছেন— ‘কার ছেলে দেখতে হবে তো, ওর বাবা শিয়ালের গর্ত থেকে ছানা বের করে আনত।’ এই সাহসিকতা, বীরত্ব ফেলুর চরিত্রে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে এবং এটা টিপিক্যালি বাঙালি। আগের দিনে যে

সাহসী বাঙালি যুবকের পরিচয় আমাদের কাছে ছিল, যাঁরা সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেই ছিলেন ডাকবুকো। সমস্যা বা লড়াই সামনে এসে পড়লে পিছিয়ে গিয়ে পৈতৃক প্রাণরক্ষায় পলায়নে ব্যস্ত হতেন না— এই ধরনের বাঙালি যুবকের একটা আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ফেলু মিস্তির। ফেলু দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরায়, ধ্যানধারণায় যথেষ্ট সংস্কৃতিবানও বটে, সেটাও তাঁর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রয়েছে।

ফেলুর সৃষ্টি ফেলুর চরিত্রের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাড়া অন্য মজাও এমন চমৎকারভাবে গুঁজে দিয়েছেন যে, সেগুলো আলাদা করে নিয়ে ফেলুকে ভাবা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ফেলু পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, চারমিনার সিগারেট খায় আবার নিয়মিত ব্যায়ামও করে। সে জানে ব্যায়ামের দ্বারা সুগঠিত শরীর তার গোয়েন্দা-কর্মের পক্ষে খুবই জরুরি। ফেলু যে খেলাধুলো ভালবাসে তা তার কথাবার্তা থেকে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রয়োজন হলে সে অ্যাকশনে ব্যস্ত হয়, সেখানেও সে দক্ষ। পাঠক হিসেবে আমরা এটাও জানি ফেলুর ঘুসিতে প্রচণ্ড জোর আছে। সব মিলে ফেলু মিস্তির একটু অন্য ধরনের গোয়েন্দা। বাঙালি জীবনের কাছে খুবই পরিচিত, যেন গলির মোড়ে কান্ডবাবুর বাড়ির পাশেই থাকে। তার মধ্যে অসাধারণ মানবিক মূল্যবোধও আছে, মানিকদার সঙ্গে এখানেই যেন ফেলুর একেবারে হাত ধরাধরি করে চলা। ফেলু সেই সমস্ত ক্রাইমের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, যেখানে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে, প্রকৃত অর্থেই যারা সমাজবিরোধী, তাদের বিরুদ্ধেই ফেলুর লড়াই তীব্রতর হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে তার হৃদয়বেস্তার পরিচয়ও আছে। তোপসে ও লালমোহনবাবুর সঙ্গে ফেলুর কথাবার্তা এবং আচরণে এই ব্যাপারটা বারবার প্রমাণ হয়েছে। গল্পের টানে যখন আমরা একটা বিশেষ ধরনের সঙ্কটের সামনে হাজির, তখন সেই নাটকীয় পরিস্থিতিতে হৃদয়বান ফেলু মিস্তির নিজের চরিত্রের সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দিকটা প্রকাশ করে।

‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ ছবিতে জটায়ু যখন মগনলাল মেঘরাজ-এর বাড়িতে নিগৃহীত হয় (লালমোহনবাবু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, তার শরীরের চারপাশে মৃত্যুবাহী ধারালো ছুরি উড়ে এসে কাঠে বিধে যাচ্ছে) তখন ফেলুর চোখেমুখে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা তার স্বাভাবিক আচরণের চেয়ে একটু অন্যরকম। পরের দৃশ্যে চিত্তিত ফেলু মেঘরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাশীর

গঙ্গার ঘাটে বসে গম্ভীর মুখে একটা কথাই ঘোষণা করে যে, সে যদি মগনলালকে শায়েস্তা না করতে পারে, তাহলে গোয়েন্দাগিরিই ছেড়ে দেবে। সাধারণ বিচারে ফেলুর এ ধরনের ঘোষণা কিন্তু স্বাভাবিক বলে মনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ একজন পেশাদার গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র হঠাৎ তার পেশা ছেড়ে দেবে কেন? এ ধরনের কাজে একজন গোয়েন্দা যে জীবনের সবকিছু রহস্যময় সমস্যা সমাধান করতে পারবেই তারই বা কী মানে হয়? ফেলুর এই উক্তি তার অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতিরই পরিচয়, মনে মনে সে তার বন্ধু জটায়ুর নিগূহীত হওয়াকে কিছুতেই মনে নিতে পারছিল না। মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে যতই চমৎকারিত্ব থাক না কেন, যদি তা হৃদয়ের আবেদনকে অস্বীকার করে তাহলে সেই সমস্ত কাজ শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন হয়ে যায়। ফেলু-চরিত্রের স্রষ্টা এই কথাটি কখনও ভুলতে দেননি। এইসব বিচিত্র গুণের জন্য ফেলু-চরিত্র আমাকে টেনেছিল, আজও টানে। ফেলু মিস্ত্রির চরিত্রে আমি বহুক্ষেত্রে মানিকদার অদৃশ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি, যা যে-কোনও চরিত্রের স্রষ্টা সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

## বারো

অন্য সব ছবির কাজ শুরু করার আগে মানিকদা যেভাবে কথাবার্তা বলতেন, সেইভাবেই ফেলু নিয়ে কথা হয়েছিল, আলাদা করে তেমন কোনও আলোচনা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। ‘সোনার কেদারা’ নিয়ে ছবি করবেন স্থির করার পর মানিকদা একদিন বললেন— ‘ভাবছি এবার ‘সোনার কেদারা’ নিয়ে ছবি করব। আউটডোরে অনেকদিন থাকতে হবে, সব খোঁজপণ্ডার নিয়েছি, চমৎকার লোকেশন পাওয়া যাবে,’ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময় আবার সেই ইলাস্ট্রেশনের রসিকতা করেছিলেন— ‘সবাই বলেছে ছবিগুলো নাকি তোমার মত করেই এঁকেছি, সুতরাং তোমাকেই ফেলু করতে হবে, বুঝলে।’

‘সোনার কেদারা’ ছবি শুরুর আগে এক ভদ্রলোক, যিনি প্যারাসাইকোলজি নিয়ে বইপত্র লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে মানিকদার চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল— এসব তথ্য আমাদের জানিয়েছিলেন। কাজ যখন শুরু হল, তখন মানিকদা তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী পোশাক ইত্যাদি কেমন হবে তার ছবিটবি এঁকে

ফেললেন। পোশাকের ডিজাইন কেমন হবে তা তো বটেই, কী ধরনের কাপড়, কোন রঙের কাপড় ব্যবহার হবে, সব কিছুই তিনি নিজের হাতে খাতায় লিখে রাখলেন। মনে আছে এই সব কাজের জন্যও তিনি অন্য কারও ওপর নির্ভর করতেন না, কাপড় ইত্যাদি কিনতে নিজেই বাজারে যেতেন। যথাসময়ে চিত্রনাট্যও হাতে পেয়ে গেলাম, ভাল করে পড়ে কোথায় কী আছে তা বোঝার চেষ্টাও শুরু হয়ে গেল। ফেলু-চরিত্র করতে গিয়ে আমার নিজের আলাদা করে কোনও বিশেষ প্রস্তুতি ছিল তা নয়। যতটুকু মনে আছে তাই-ই লিখছি।

ফেলুর আচার-আচরণ ছাড়া যে ব্যাপারটা আমি নিজে মনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম তা হল, ফেলু একজন ‘থিংকিং ম্যান’। তার চরিত্রে যে চিন্তাশীলতা আছে সেটা যেন আমি কিছুতেই ভুলে না যাই। প্রথমে বুদ্ধিমান একজন মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে রহস্যের মধ্যে ঢুকতে চাইছে— এটা যেন আমার মুখে-চোখে প্রকাশ পায়, এ ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম। গোটা ছবিতে নিজের কাজে আমি এই অভিব্যক্তির একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত কতটুকু কী পেরেছিলাম তা মানিকদা এবং দর্শকরা বিচার করেছেন, এ-ব্যাপারে আমার নিজের কিছুই বলার নেই। বিশেষভাবে চোখ, দুই হু এবং কপালের কুঞ্চন ইত্যাদির ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম। একজন বুদ্ধিমান মানুষের চোখ প্রয়োজনে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। এমন কোনও বুদ্ধিমান মানুষ হয়ত আছেন যে, তিনি সেটাও আড়াল করতে পারেন এবং সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন্ত, উজ্জ্বল (কখনও চঞ্চলও বটে) ও বাঙময় চোখের দৃষ্টি একজন বুদ্ধিমান মানুষের মনের মধ্যে গভীর চিন্তার চলাফেরা বুঝিয়ে দেয় বলে আমি বিশ্বাস করি। ফেলুর ক্ষেত্রে আমি সেটাই ব্যবহার করেছিলাম এবং মানিকদা আপত্তি করেননি।

‘সোনার কেল্লা’ ছবির একটা দৃশ্যের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, যে দৃশ্যে ডক্টর হাজরার কার্ডটা নিয়ে সেখানে ‘হাজরা’ শব্দটির বানানে ‘জে’ না ‘জেড’ কী ব্যবহার হয়েছে ইত্যাদির চিন্তা ফেলুর মাথায় ভিড় করছে, সেই দৃশ্যটার কথা বলছি। একটা নিচু চেয়ারে আমি বসে আছি, আমার সামনে কার্ডটা পড়ে আছে। কপালে হাত রেখে ভাবছি, আমার মাথার মধ্যে চিন্তার বিশ্লেষণ চলছে সেটা বোঝানোর জন্য আমি কপালে হাত রেখেছিলাম।



একজন অসাধারণ পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলে চরম মুহূর্তে একটা ছোট্ট নির্দেশে অভিনেতার অভিনয়ের ডাইমেনশনই বদলে যায়। রিহাসাল চলছে, এমন সময় মানিকদা ছোট্ট করে বললেন— ‘সৌমিত্র, এইখানে তুমি তোমার কপালে রাখা হাতের আঙুলগুলো ড্রামিং-এর মত করে ব্যবহার কর, যেন আঙুলগুলো দিয়ে কপালে বাজনা বাজাচ্ছ এমন ভঙ্গি কর।’ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর নির্দেশ আমার মাথায় কাজ করল এবং চিন্তাশীল ফেলুর অভিব্যক্তি একটা অন্য মাত্রা পেয়ে গেল। চোখের ব্যবহারের উদাহরণ আছে, এরই কাছাকাছি আর একটা দৃশ্যে যেখানে চিত্তিত ফেলু পায়চারি করছে এবং ক্যামেরা তাকে ধরে রেখেছে।

‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ ছবিতে ক্যাপটেন স্পার্ক-এর সঙ্গে ফেলুর কথাবার্তার মধ্যে ফেলু কেন ছোটদের কাছে এত জনপ্রিয় তাও বোঝা গেছে। মাত্র কয়েকটা সংলাপে ফেলু একজন বালকের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলতে পারে, অবশ্য তার জন্য তাকে নিজের ‘মগজাত্ত্ব’র সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের রিভলভারটা দেখাতে হয়েছে। সুরসিক লেখক ও চিত্রনাট্যকার যেন এরই মাধ্যমে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধির গোয়েন্দার প্রতি আর একজন বুদ্ধিমান গোয়েন্দার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত বুঝিয়ে দিলেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ছবিতে, কাজের সময়েও মানিকদা কখনও ছোটদের ছোট করে দেখতেন না, বরং বয়স্ক বন্ধুদের মতই ব্যবহার করতেন, কখনও এর ব্যতিক্রম দেখিনি।

ফেলুর চরিত্র ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ তো মাত্র দুটো ছবিতেই পেয়েছিলাম। কিন্তু এ ছাড়া ফেলুর গল্প বা উপন্যাস যখনই প্রকাশিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই তা পড়ে নেওয়ার অভ্যাস ছিল। মানিকদা নিজে অনেক সময় আমাদের বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে শোনাতে, সে লেখার শুরু, মাঝামাঝি বা শেষ যা-ই হোক। মানিকদার পড়ার ভঙ্গি এমনই আকর্ষণীয় ছিল যে, আমরা কয়েকজন ভাগ্যবান তা দারুণ উপভোগ করতাম।

ফেলু যেমন আমিই করব বলে মানিকদা ভেবে রেখেছিলেন, তেমন ‘জটায়ু’ চরিত্রের জন্য সন্তোষদার কথাও তাঁর চিন্তায় ছিল। আমার নিজের বিশ্বাস ‘সোনার কেদা’ যখন হয়েছিল, তখন হয়ত চেষ্টাচরিত্র করলে মানিকদা আমাকে ছাড়া আর কাউকে ফেলু করে তুলতে পারতেন, কিন্তু সন্তোষদা ছাড়া জটায়ু চরিত্রায়ন অসম্ভব ছিল। এখন মনে পড়ছে, ফেলুর

অন্য কাহিনীর বদলে ‘সোনার কেপ্লাই পছন্দ করার আসল কারণ ছিল কাহিনীতে জটায়ুর উপস্থিতি। এ সম্পর্কে মানিকদার সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল, বলেছিলেন— ‘সোনার কেপ্লাই ভাল হবে কেন জান, ওটাতে তো লালমোহনবাবু আছেন, লালমোহনবাবু যতদিন আসেননি ততদিন ফেলু যেন একটু ড্রাই বুঝলে, সোনার কেপ্লায় লালমোহন এসেছেন বেশ একটু হিউমারাস হবে ব্যাপারটা, আর তাছাড়া সন্তোষ রোলটা দারুণ করবে...’ ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্তোষদা ও জটায়ু— এ প্রসঙ্গে কারও কোনও বাড়াবাড়ি বা মিথ্যাচারের সুযোগ নেই। সন্তোষদা ছাড়া জটায়ু আমি ভাবতে পারি না। অন্যরাও ভাবতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা, স্বয়ং সত্যজিৎ রায় ভাবতে পারতেন না। সন্তোষদার মৃত্যুর পর মানিকদা তো বলেই ফেলেছিলেন— ‘আমি আর ফেলু নিয়ে কোনও ছবি করব না, জটায়ু ছাড়া ফেলুর গল্প হয় না, আর সন্তোষ ছাড়া জটায়ু হবে না।’

## তের

জটায়ু চরিত্রে সন্তোষদার অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্রের অমর সম্পদ হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে সন্দীপ রায় যখন হিন্দিতে ফেলুর কাহিনী করল, তখন এ প্রসঙ্গে মানিকদার সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল। প্রথম এপিসোডটা দেখার পর মানিকদার সঙ্গে তা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম, সে সময়ে মানিকদা বলেছিলেন— ‘না, বাঙালিদের ওটা পছন্দ হবে না, তুমি নেই, সন্তোষ নেই। এটা ওঁরা নেবেন না।’

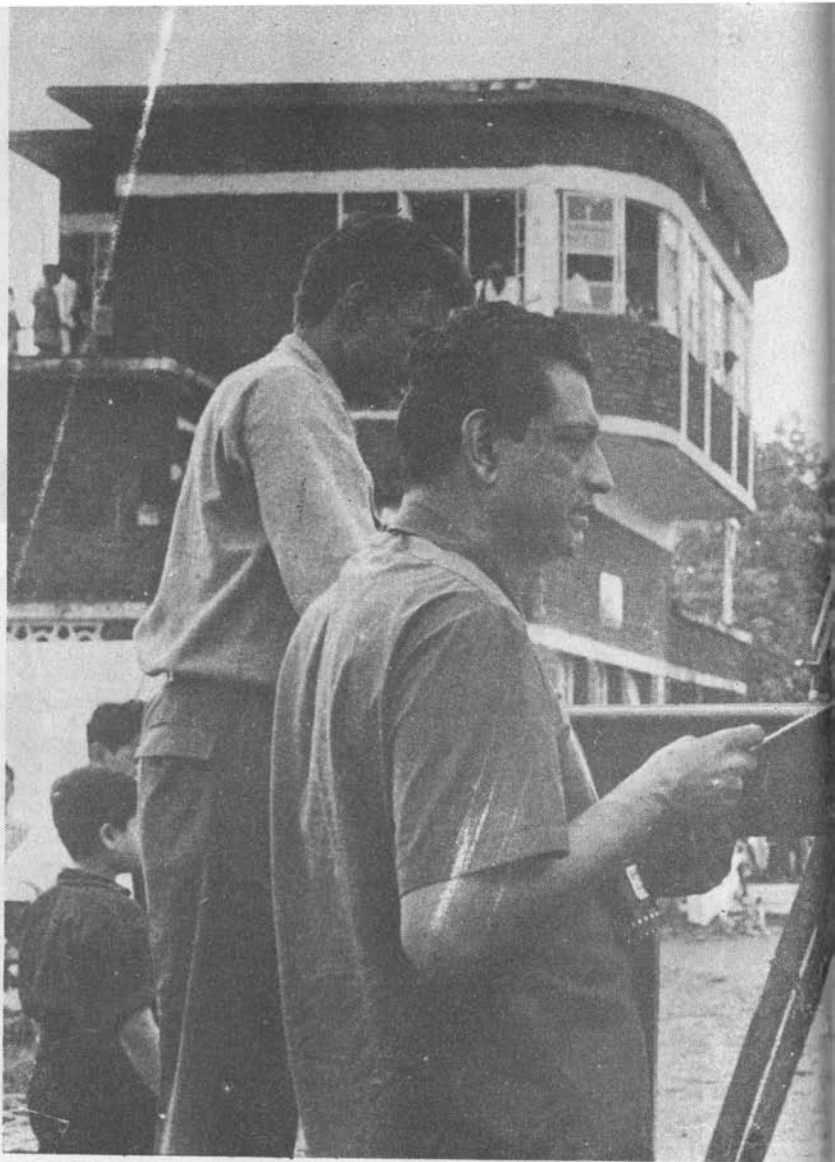
সিধু জ্যাঠা যেমন আর পাঁচটা জ্যাঠামশাইয়ের মত নন, তেমনি জটায়ুও কোনও সহজলভ্য কৌতুকময় চরিত্র নয়। একটা গোয়েন্দা-কাহিনীতে আর একজন সদাহাস্যময় জীবন্ত গোয়েন্দা-কাহিনী লেখকের উপস্থিতি বোধহয় কমই আছে। জটায়ুর কথাবার্তা, কথা বলার ভঙ্গি সবই কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলেই উপভোগ করেছেন। জটায়ুর মন সর্বদাই তাঁর পরবর্তী গোয়েন্দা-কাহিনীর নামকরণের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। আলাপে, উদ্বেগে তাঁর একেবারে নিজস্ব ঢঙে উচ্চারিত খাঁটি রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজি থাকে। দ্রুত কথা বলতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে তিনি ‘হাঁসজারু’র মত



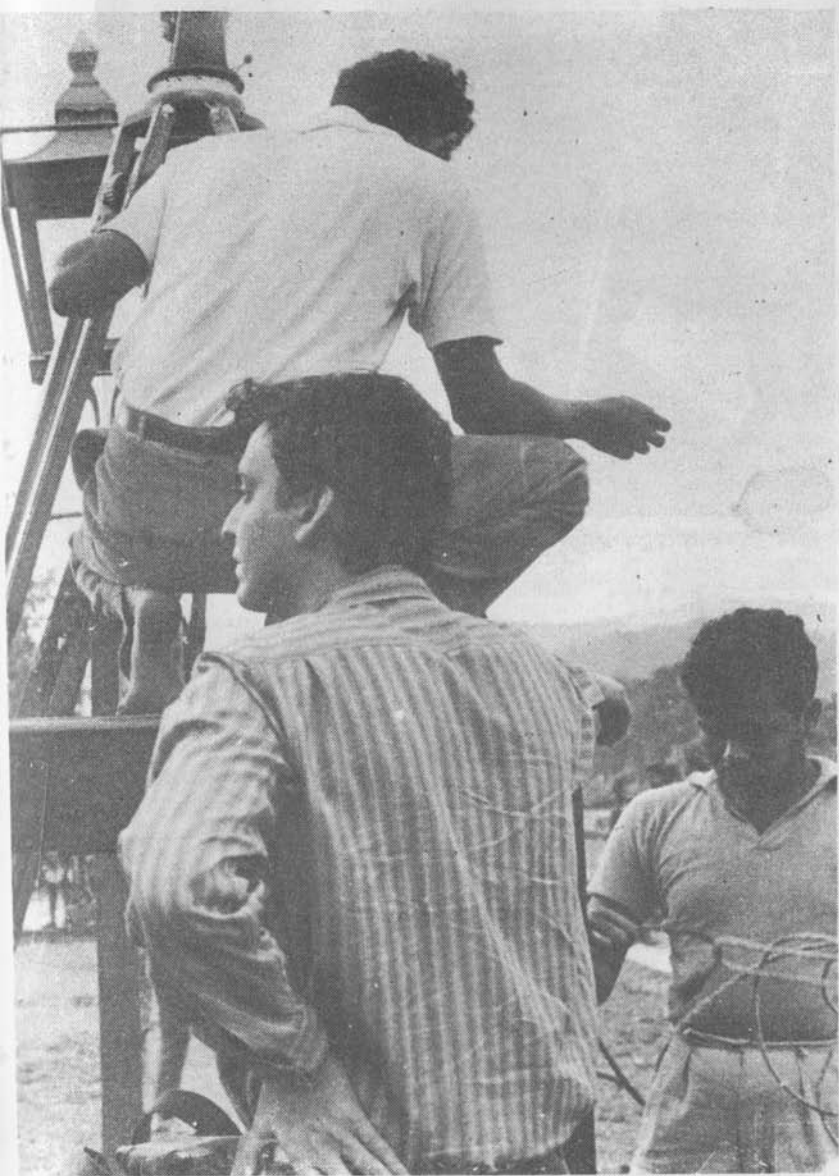
‘সোনার কেল্লা’-র সেট-এ



‘সোনার কেল্লা’-র আউটডোরে মধ্যাহ্নভোজন, জয়পুর



‘কাপুরুষ’-এর লোকেশনে ডুয়ার্সে





নিজের প্রথম নাচের অনুষ্ঠানে মানিকদাকে মালা পরাচ্ছে পৌলমী

মোনা চৌধুরী

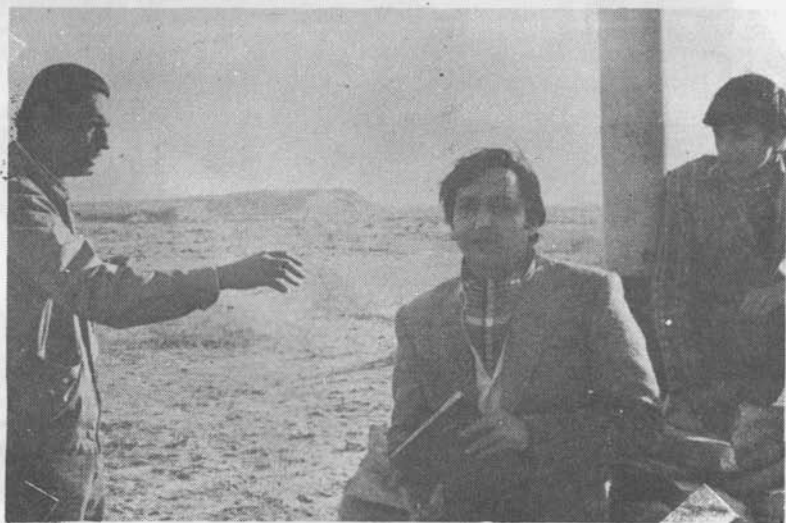


'গনশঙ্কর'-র সেট-এ

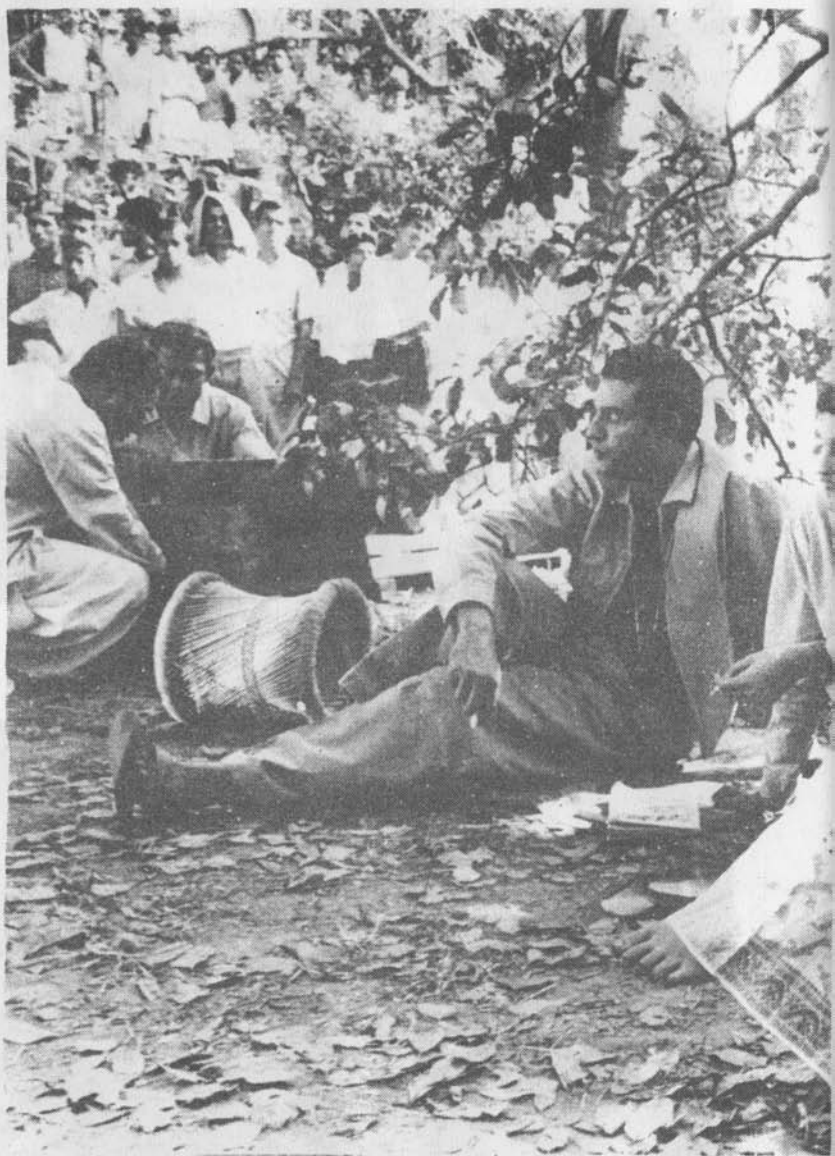
হীরক সেন



‘চাকলতা’



‘সোনার কেয়া’-র লোকেশন, রাজস্থানে নির্দেশ দিচ্ছেন মানিকদা



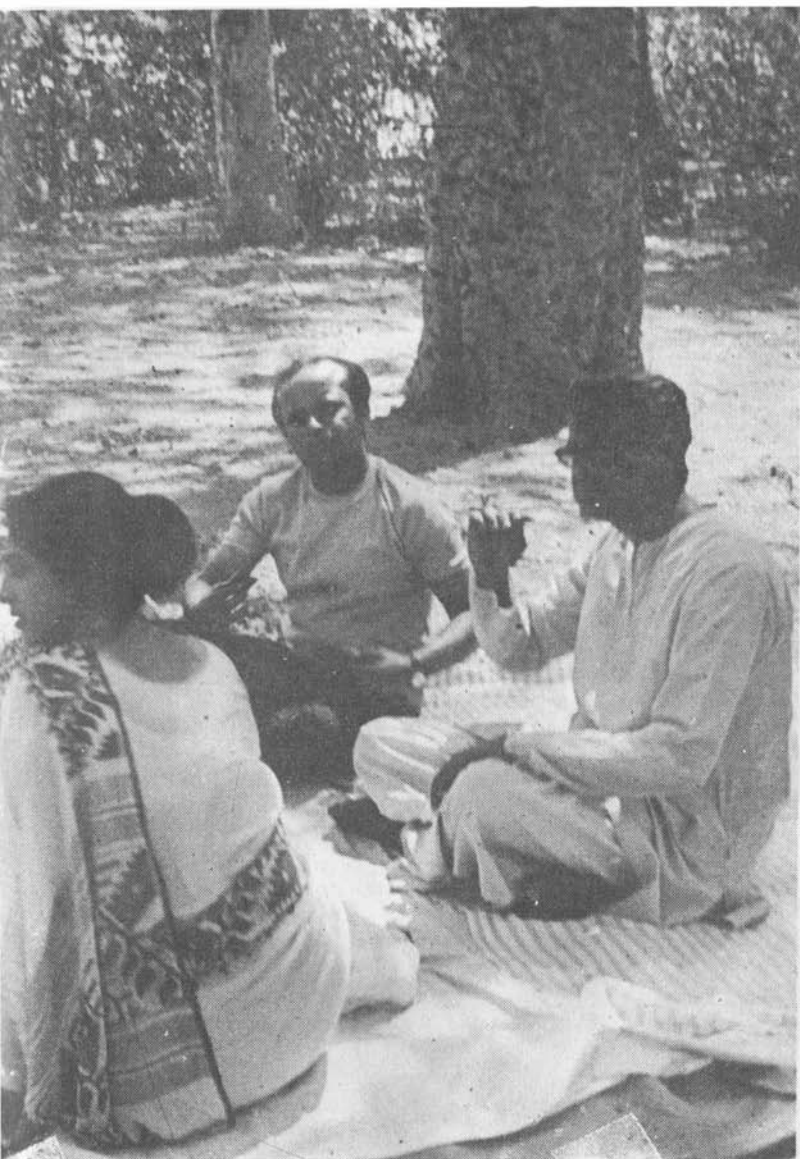
‘চাকলতা’-র লোকেশনে, বালিতে







‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র মেমারি গেম

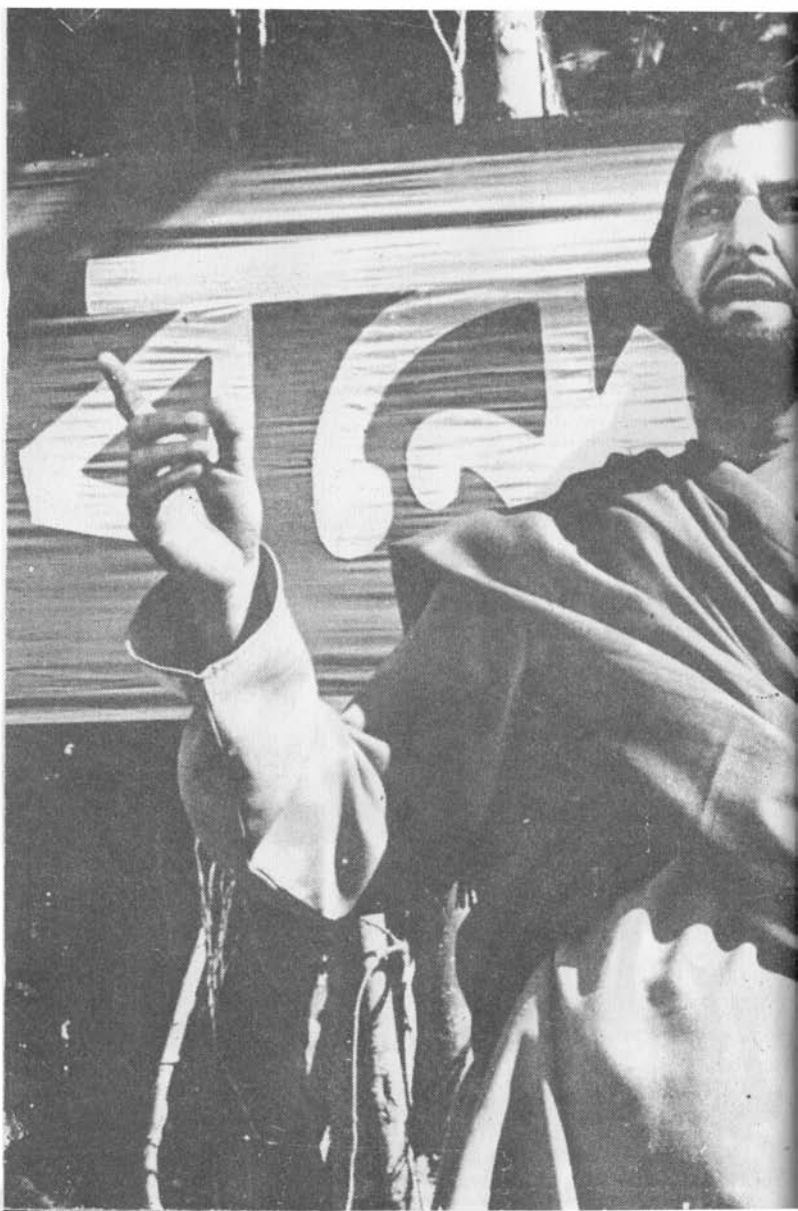


নিমাই ঘোষ



‘হীরক রাজার দেশে’, রাজার মূর্তিভাঙার দৃশ্য

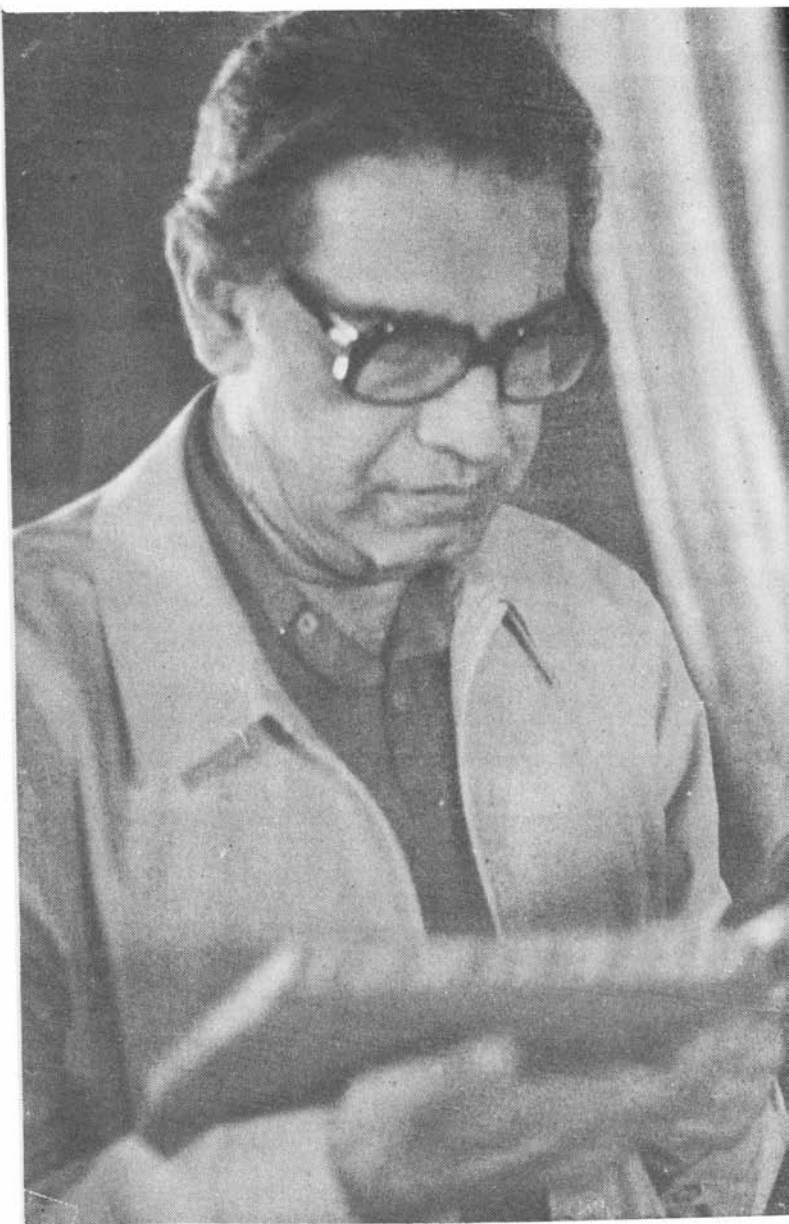




‘ঘরে বাইরে’, সন্দীপের বক্তৃতার দৃশ্য



হীরক সেন

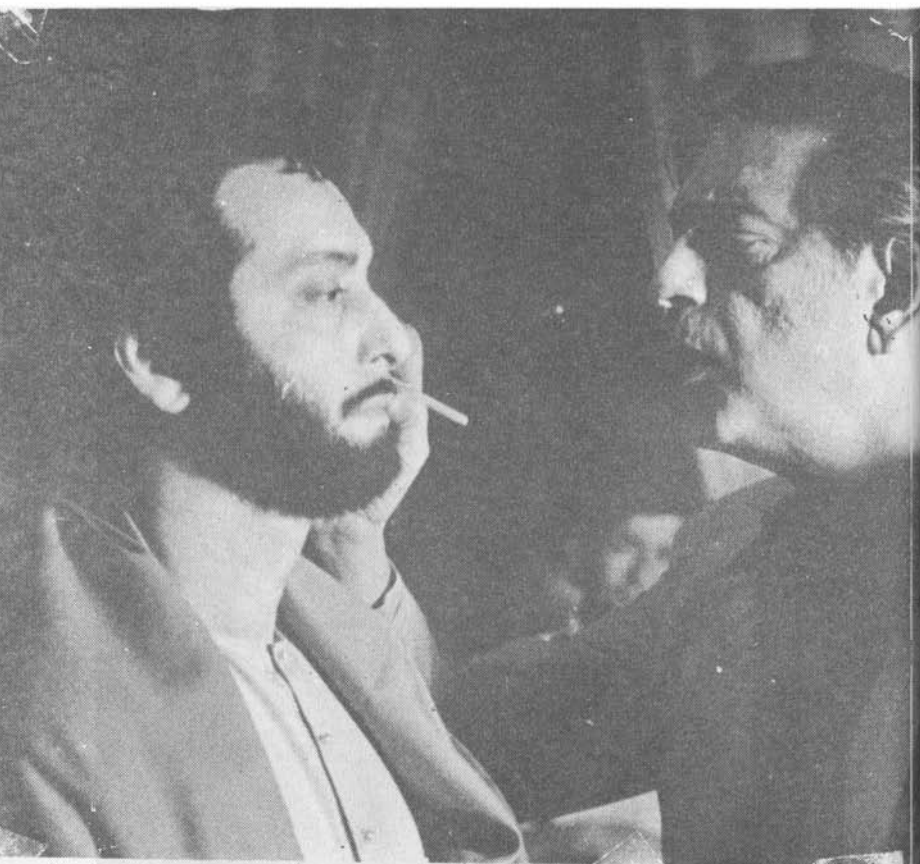


‘ঘরেবাইরে’-র সেট-এ, দৃশ্যাটি পড়ে দিচ্ছেন মানিকদা





হীরক সেন



রয়ে বাইরে'-র সেট-এ. মেকআপ ঠিক করে দিচ্ছেন মানিকদা

হীরক সেন

‘হাঁয়েস’ বলে ফেলেন। উট কাঁটা বেছে খায় কিনা— এ জাতীয় প্রশ্ন শুধু তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব। ফেলুদা, এমনকি কখনও কখনও তোপসেও লালমোহনবাবুর অজস্র ভুল ধারণা ভেঙে দেয়। তবে বিস্মিত করার কৃতিত্ব কিন্তু একেবারে একতরফা নয়, মাঝে মাঝে লালমোহনবাবু ফেলু মিস্ত্রিকেও চমকে দেন, যেমন— ‘রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল সেটা জানতেন?’ এমন কথাও জটায়ুর মুখে আছে।

সন্তোষদার সত্যি সত্যিই কিন্তু উটের পিঠে চড়তে অপরিমিত কোনও ভয় ছিল না। উটের কথায় পরে আসব, এখন সন্তোষদার কথা বলি। মানিকদা ‘সোনার কেপ্লা’ ছবিতে সন্তোষদার যে বিচিত্র ব্যায়াম-পদ্ধতি দেখিয়েছেন সেটা ছবির প্রয়োজনে করতে হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সন্তোষ দত্ত অত্যন্ত ফিট মানুষ ছিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। একজন পেশাদার অভিনেতার পক্ষে যা করা খুবই স্বাভাবিক। সন্তোষদা অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, বলতে পারি ওঁর ফিটনেস বয়স্ক অ্যাথলিটদের কাছাকাছিই ছিল। ‘লাঠি’ স্টেশনে তোলা সেই দৃশ্যের কথা যাঁরা মনে করতে পারবেন তাঁদের বলি, ওখানে সন্তোষদা যে প্রকারভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ছিলেন তা কিন্তু শারীরিক সক্ষমতারই পরীক্ষা পরিচয়। একজন নিয়মিত শরীরচর্চা না করলে ও ধরনের মজাদার ভঙ্গি মসৃণভাবে করতে পারবেন না, করা সম্ভব নয়। ‘সোনার কেপ্লা’ ছবি করার আগে আমরা কেউই কখনও উটের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিনি। উটের চলনে যে ছন্দ, সেটাও অপ্রচলিত এবং চলার সময় উটের শরীরের ওঠা-নামাও অদ্ভুত ধরনের সেটাও ঠিক। কিন্তু আমরা সবাই যতটা মজা পেয়েছিলাম, ততটা ভয় কেউই পাইনি। ছবিতে লালমোহনবাবুর যে কাঁদো-কাঁদো অবস্থা হয়েছিল সেটা পরিচালক মানিকদার বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সন্তোষদার অভিনয়-নৈপুণ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

‘সোনার কেপ্লা’ ছবিতে বয়স্ক চরিত্র ছাড়া কয়েকজন কম বয়সের চরিত্রও ছিল, মুকুল তো গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র। মুকুলের চরিত্রে অভিনয় করেছিল শ্রীমান কুশল চক্রবর্তী। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চটপটে স্বভাবের ছেলে, তার সঙ্গে আমরা সবাই উপভোগ করতাম। সমস্ত দিনের শেষে কাজকর্মের ঝামেলা মিটিয়ে আমরা হয়ত হোটеле ফিরছি, শরীর আর বইছে না। কিন্তু কুশলকুমারের তখনও সব বিষয়েই অদম্য কৌতূহল, অফুরন্ত বিচিত্র সব প্রশ্ন তার। আমরা কেউ কেউ কুশলের কিছু প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, বাকিগুলো

হয়ত বলছি— ‘পরে তোমাকে বলব, কেমন?’ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানিকদার ব্যাপারটা অন্যরকম, তিনি ছোটদের একেবারে অকৃত্রিম বন্ধু, ক্লাস্তি যেন তাঁকে স্পর্শই করেনি এমন মেজাজে ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে তিনি তার সব প্রশ্নের জবাব দিতেন। রাজস্থানের বিচিত্র সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদেরই মুগ্ধ করে রেখেছিল, আর ছোট্ট ছেলে কুশলকে তো করবেই। তাই দিনের বেলাতেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে মানিকদাকে অসংখ্য প্রশ্ন করত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার জবাব পেয়ে যেত। মানিকদা শিশু বা বালক অভিনেতাদের কাছ থেকে আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় কী কৌশলে করিয়ে নিতেন, তা নিয়ে অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করেন। এর একটাই কৌশল, ছোটদের তিনি কখনও ছোট বলে ভাবতেন না, বড়দের সমানই গুরুত্ব দিতেন এবং ছোটদের সঙ্গে তাদের মত করেই মিশতেন। সেইজন্যেই তাদের সঙ্গে সহজেই তাঁর বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যেত।

তোপসে চরিত্রটাও মানিকদার মজাদার মেজাজের মৌলিক সৃষ্টি বলেই আমার মনে হয়। ফেলুর সঙ্গে কিশোর তপেশের বয়সের অনেক তফাত, তবুও সে ফেলুর সমস্ত অভিযানের সঙ্গী। কোনও গোয়েন্দার এমন কমবয়সী সহকারী আছে এ ধরনের নজির খুব একটা দেখা যায় না। ফেলু-কাহিনীর মধ্যেই দেখা গেছে ফেলুদার সাহচর্যে তোপসের বুদ্ধিতে যেমন শান পড়ছে, তেমনি তার ক্ষিপ্ততাও বেড়েছে। সেভাবে চিন্তা করলে বলা যায় তোপসে ফেলু চরিত্রেরই এক্সটেনশন। তোপসের মধ্যে যেন আর একটা ফেলু মিস্তির তৈরি হচ্ছে। ‘সোনার কেদা’ এবং ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ দুটি ছবিতেই তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়। সিদ্ধার্থের মিস্তি ব্যবহার এবং বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের জন্য মানিকদা-সহ ইউনিটের সকলেই তাকে বেশ পছন্দ করতেন। তোপসেও ব্যক্তিগত জীবনে ‘চট্টোপাধ্যায়’ পদবির অধিকারী বলে শুটিং দেখতে আসা বাইরের অনেকে আমাকে প্রশ্ন করতেন সিদ্ধার্থ আমার ছেলে কিনা!

পরিচালক সত্যজিৎ রায়, অসাধারণ রুচিবান সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গলাভের অর্থই হচ্ছে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ। গাড়ি করে বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সেখানেই রাস্তায় কাচ ছড়িয়ে মন্দার বোস ফেলু মিস্তির অ্যান্ড কোং-এর অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেছে। সেই গাড়ির চাকা ফেঁসে যাওয়ার স্পটে মানিকদা একটা সুন্দর দৃশ্যের শুটিং করেছিলেন, কিন্তু সেটা

শেষ পর্যন্ত ছবিতে নেই। মরুভূমির বালি, কাঁটা গাছ, সূর্যের আলো ইত্যাদি নিয়ে অনেক যত্নে দৃশ্যটা টেক করেছিলেন মানিকদা। গাড়ির চাকা সারানো হচ্ছে আর সেই সময়ে ফেলু, তোপসে এবং জটায়ুর মধ্যে কিছু কথাবার্তা ছিল। কিন্তু পরে এডিটিং টেবিলে চিত্রনাট্যের দাবি অনুযায়ী দৃশ্যটা বাহুল্য মনে হওয়ায় মানিকদা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। মানিকদা শিল্পকে কী অসাধারণ যত্ন ও সততার সঙ্গে বিচার করতেন। অত সুন্দর একটা দৃশ্য বাদ দিতে একমুহূর্তও সময় নেননি, কারণ ওঁর মনে হয়েছিল দৃশ্যটা অপ্রয়োজনীয়, চিত্রনাট্যে যেন অতিরিক্ত মেদ। এটাও অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা, কীভাবে একজন পরিচালককে লোভ সংবরণ করতে হয়।

আমার মনে আছে, অনেকদিন আগে মানিকদার একটা লেখায় পড়েছিলাম— ‘ছবিতে দুটো ইমপিওরিটি আমি চাই না, একটা হচ্ছে পিক্টোরিয়াল আর অন্যটা হচ্ছে থিয়েট্রিক্যাল।’ সত্যিই মনে থাকার মত কথা, ‘থিয়েট্রিক্যাল’ শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ‘পিক্টোরিয়াল’ ইমপিওরিটি বলেছেন যদি সেটা ‘ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য ন্যারেটিভ’ না হয়।

‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ ছবিটা হয়েছিল ‘সোনার কেপ্লা’র প্রায় বছর তিন-চার পরে। ফেলুনাথের জন্য আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নিইনি। শুধু একটা চিন্তাই মাথায় ছিল যেন দুটো ফেলু আলাদা না হয়ে যায়, অভিনয়ের ধারার মধ্যে যেন কন্টিনিউটি বজায় থাকে।

আজ এতদিন পরে এই বিষয় নিয়ে লিখছি বলে নয়, একদিক থেকে ছবি হিসেবে আমার ‘সোনার কেপ্লা’-র চেয়েও ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’ ভাল লাগে। ‘সোনার কেপ্লা’ যেমন রাজস্থানের অবাক-করা দৃশ্য ইত্যাদি নিয়ে মন জয় করে ফেলে, তেমনি ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’-এ জটিল চিন্তার খোরাক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষদের আকর্ষণ করে। কাশীর দৃশ্যাবলী তো অসাধারণ! বস্তুতপক্ষে কাশী চিরকালই মানিকদাকে টানত। ছবি তৈরির প্রথম জীবনে সাদা-কালোয় কাশীর গঙ্গা, গঙ্গার ঘাট অমর করে রেখেছেন ‘অপরাজিত’ ছবির অসংখ্য দৃশ্যে। এবারে রঙিন ছবিতে কাশী। রাত্রিতে সেই গলির দৃশ্যগুলো, মছলিবাবা যে বাড়িটাতে থাকত সেই বাড়িটাকে ঘিরে নানারকম জটিল শট— প্রচুর পরিশ্রম ও যত্ন নিয়ে মানিকদাকে কাজ করতে হয়েছিল।

আরও একটা কথা, যার উল্লেখ এই লেখার গোড়ার দিকেই করেছি। যে সমস্ত সমাজবিরোধী দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরা, তারপর শেষ দৃশ্যে যেভাবে জটায়ুর চারপাশে ছোঁরা বিদ্ধ করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে মছলিবাবার ছদ্মবেশধারী ফেলুনাথ মগনলালের শরীরের চারদিকে গুলি করার দৃশ্য, মগনলালের স্নায়ুর ওপরেও একই ধরনের চাপ পড়ছে, যেন একই ধরনের প্রতিশোধ নিচ্ছে ফেলু মিস্তির— এ সমস্ত দারুণভাবে উপভোগ করেছিলাম। ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’-এ গল্পের চমকটা যেন আরও বেশি। শেষ দৃশ্যে গোয়েন্দা ফেলু মিস্তির কী কাণ্ড ঘটাবে, তা জটায়ু ও তোপসের কাছেও অজানা ছিল।

শেষ দৃশ্যের সংলাপ— ‘যারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে’... ইত্যাদি এর মধ্যে একটা উদ্দীপক দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, অন্তত আমার তো অভিনয় করতে করতে তাই-ই মনে হয়েছিল।

আর এ দেশাত্মবোধ তো মানিকদার অস্তুরকরণের মধ্যে থেকেই এসেছিল। দেশকে এমন করে ভালবাসতেন বলেই তো তিনি এত সার্থক শিল্পী— এত মহান মানুষ।

## চোদ্দ

গুপী গাইন বাঘা বাইন-কে নিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক চিত্রনাট্য লিখলেন মানিকদা— ‘হীরক রাজার দেশে’। মনে আছে লেখার জন্য মানিকদা কয়েকটা দিন দিনের বেশিরভাগ সময় একটা হোটেলে গিয়ে থাকতেন। বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া, টেলিফোন ইত্যাদি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে লেখার কাজ করবেন বলেই এমন করতেন। তার আগে অনেক সময় চিত্রনাট্য লিখতে হলে বাইরে কোথাও চলে যেতেন। ‘মহানগর’ ছবির চিত্রনাট্য লিখতে বৌদিকে নিয়ে পুরী গিয়েছিলেন। সেই একই সময়ে আমি আর দীপাও পুরীতে ছিলাম, ছুটি কাটাতে। পারিচালক অসিত সেনও তখন পুরী গিয়েছিলেন ওঁর একটা ছবির চিত্রনাট্য লিখতে। মানিকদা আর অসিতদা দুজনেই বি এন আর হোটেলে ছিলেন, আর আমরা একটা বাড়িতে উঠেছিলাম। মাঝে মাঝে যেতাম বি এন আর হোটেলে।

মানিকদা সারাদিন প্রায় ঘর থেকে বেরোতেনই না, লিখতেন। শুধু বিকেলে একবার ঘণ্টাখানেক সমুদ্রের ধার দিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। একদিন, সন্ধ্যার ঠিক আগে দোতালার বারান্দায় অসিতদার সঙ্গে আমরা গল্প করছি, দূর থেকে দেখতে পেলাম পাজামা-পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘদেহী মানিকদা সমুদ্রতটে হেঁটে যাচ্ছেন। অসিতদা বলে উঠলেন— ‘দেখুন, দেখুন মানিকবাবু যাচ্ছেন। আচ্ছা, ওই লোকটা বিশ্ববিখ্যাত হবে না তো কি আমরা হব! আমিও চিত্রনাট্য লিখতে এখানে এসেছি, উনিও চিত্রনাট্য লিখতে এখানে এসেছেন। অথচ দেখুন, আমি সারাদিন আড্ডা মারছি— সমুদ্রে স্নান করছি— সন্কেবেলায় রাম খাচ্ছি, লেখা আর এগোচ্ছে না। আর উনি সারাদিন সমুদ্র-টমুদ্র অগ্রাহ্য করে ঘরের মধ্যে বসে বসে লিখে যাচ্ছেন, একবার শুধু সন্কের আগে একটু সমুদ্রের ধারে হাঁটতে যাচ্ছেন। এই-ই তো সাধনা।’

‘হীরক রাজার দেশে’-র চিত্রনাট্য যখন পড়ে শোনালেন তখন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ওই রূপকথার মত স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ অ্যালিগরিটি শুনতে শুনতে। ‘হীরক রাজার দেশে’-র গল্পটার মধ্যে যে রাজনৈতিক রূপকটা ছিল সেটা আমাকে বিস্মিত করেছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণটা সরাসরি না এসে রূপকের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল বলেই এতটা কাব্যিক মনে হয়েছিল লেখাটা। আর পদ্যে-ছড়ায় সংলাপ লেখাটা মনকে মাতিয়ে দিয়েছিল, গোটা ছবিতে কবির মতই মানিকদা ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন।

‘হীরক রাজার দেশে’র বেশিরভাগ আউটডোর শুটিং হয়েছিল পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় ও কাছাকাছি অন্য কিছু অঞ্চলে। অল্প একটু শুটিং করতে রাজস্থানও যেতে হয়েছিল। রাজস্থানের কেদারা আর পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চল এবং স্টুডিওতে তৈরি সেটে— কী সুন্দরভাবে যে মানিকদা একই প্রবহমান সিকোয়েন্সের মধ্যে মিশিয়েছিলেন তা ভাবলেই আশ্চর্য লাগে। তবে এ কাজটা তো মানিকদা বরাবরই করেছেন। মনে আছে হীরক রাজার দুটো মূর্তি করানো হয়েছিল। একটা বিশাল, আর একটা একেবারে সেইরকমই দেখতে, কিন্তু অনেক ছোট। মূর্তির ক্রোজআপ ইত্যাদির কাজে সেটা সুবিধেজনক হয়েছিল।

মানিকদার সঙ্গে ছবি করাটাই এত ভাললাগার অনুভূতিতে ভরা থাকত যে যে-সব সময় তাঁর কোনও ছবিতে কাজ করছি না, তখন সমস্ত মন উন্মুখ

হয়ে থাকত কবে আবার মানিকদার ছবিতে কাজ করব। যে-সব বিষয় বা কাহিনী নিয়ে মানিকদার ছবি করার ইচ্ছে থাকত— যেগুলো নিয়ে মাঝে মধ্যেই আলোচনা করতেন, সেগুলো নিয়ে ভাবতাম। ভাবতাম কবে মানিকদা ছবিটা করবেন, আমি তাতে কাজ করার সুযোগ যদি পাই! এই রকমের পরিকল্পিত একটা ছবি ছিল ‘ঘরে বাইরে’। আমি ‘অপুর সংসার’ করতে আসার পর থেকেই শুনে আসছি মানিকদার ‘ঘরে বাইরে’ নিয়ে ফিল্ম করার ইচ্ছে। আমি আসার আগে থেকে তো বটেই, এমনকি পথের পাঁচালীরও আগে মানিকদার ‘ঘরে বাইরে’ সম্বন্ধে এই আগ্রহটা ছিল। অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিয়ে এই ছবিটা করার কথা উনি ভেবেছেন, আমি আসার আগে ও পরে। কিন্তু সব কটি রোলে ঠিক ঠিক কাস্টিং-এর অসুবিধের জন্যেই বোধহয় ছবিটা করতে পারেননি। প্রধান সমস্যাটা অবশ্যই ছিল বিমলার ভূমিকায় অভিনেত্রী খুঁজে পাওয়া। অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রীকে নিয়ে ভাবলেও শেষ পর্যন্ত মানিকদার পছন্দ হত না। অশনি সংকেতের শুটিং করার সময় মানিকদার সঙ্গে একটি চিত্রানুরাগিণী মেয়ের আলাপ হয়— মানিকদা স্থিরও করেন তাকে দিয়েই বিমলা করাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলার পারিবারিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় সেবারও ছবিটা হয়নি। সন্দীপ ও নিখিলেশের কাস্টিং নিয়েও কিছু-কিছু সমস্যা ছিল। আমাকে প্রথম প্রথম বলতেন, ‘নিখিলেশ তো তুমি করতে পার— ভাল একটা সন্দীপ পেলেই ছবিটা করব।’ তারপর একসময় বলতেন, ‘নিখিলেশ, সন্দীপ— তোমাকে দিয়ে দুটোই হয়, আমি যদি সন্দীপ পেয়ে যাই তাহলে তুমি নিখিলেশ করবে— আর যদি নিখিলেশ করার মত কাউকে পাই তাহলে তুমি সন্দীপ করবে।’

কিন্তু ‘ঘরে বাইরে’ শেষ পর্যন্ত চিত্রায়িত হওয়ার কয়েক বছর আগে থেকেই মানিকদা মন স্থির করে ফেলেছিলেন আমাকে দিয়ে সন্দীপই করাবেন এবং সেই জন্য নিখিলেশ চরিত্রের অভিনেতাই খুঁজতেন। কেন এরকম ভেবেছিলেন তার দুটো কারণ গুঁর ‘ঘরে বাইরে’ নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছিল। বলেছিলেন— ‘বিমলার ওরকম দেবতুল্য স্বামী থাকতে অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে হলে সে পুরুষটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হতে হয়।’ রোমান্টিক নায়কের ভূমিকাভিনেতাকে দিয়ে সন্দীপ



কন্নানোর সেটা একটা কারণ হতে পারে। আর একটা কারণ প্রায় সোজাসুজিই আমাকে বলেছিলেন, যদিও সেটা নিজে বলতে বেশ একটু বিব্রতই বোধ করছি। বলেছিলেন— ‘সন্দীপের অনেক বড় বড় বক্তৃতা থাকবে— তারপর যা দিয়ে সে বিমলার মন জয় করছে, তা তো তার কথা। এখনকার বেশিরভাগ অভিনেতার বাংলা ভাল নয়। সেই জন্যেই তোমাকে ছাড়া সন্দীপ ভাবা মুশকিল।’

ছবিটা যখন হবে বলে স্থির হল, তখন সন্দীপের প্রথম আসার দৃশ্যের বক্তৃতাটা চিত্রনাট্যের কপি দেওয়ার সময়ই আমাকে বলেছিলেন মুখস্থ রাখার জন্যে। কেননা তখন ভেবেছিলেন একটা মাত্র শটে পুরো বক্তৃতাটা টেক করবেন। পরে শুটিংয়ের সময় অবশ্য একসঙ্গে আমাকে সবটা বলতে হয়নি। মধ্যে বিমলার রি-অ্যাকশন দেখানোর প্রয়োজনে সন্দীপের বক্তৃতাটা দু-তিনটি শটে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তবে আমার মুখস্থ থাকাটা খানিকটা কাজে লাগিয়েছিলাম ডাবিংয়ের সময়। একবারেই সবটা ঠিকঠিক করে দিয়েছিলাম। মনে আছে মানিকদা খুশি হয়ে হেসেছিলেন। সেই পুরস্কারটুকু মনের মধ্যে ধরে রেখেছি। আর একটা ব্যক্তিগত কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। চিত্রনাট্য পড়ে শোনার পর বলেছিলেন— ‘যাক শেষ পর্যন্ত ‘ঘরের বাইরে’টা হচ্ছে, তুমি আর কিছু দিন ইয়ং থাকলে তাহলে।’ তখন আমার বয়স মধ্যচম্বিশ পেরিয়ে গেছে কিনা।

## পনের

‘ঘরে বাইরে’ তো শেষ পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু এমনও কিছু ছবির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল যা করা আর হয়ে ওঠেনি। যেমন ‘মহাভারত’ বা ‘একটি জীবন’। মহাভারত হলে তাতে আমার একটা রোল থাকত এটা যেমন আমাকে মানিকদা জানিয়েছিলেন, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর ‘একটি জীবন’ নিয়ে যখন চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেছিলেন, তখন যে আমাকে প্রধান ভূমিকার জন্য ভাবছেন না তাও আমি জেনেছিলাম। জেনেছিলাম কারণ আমি মানিকদার কাছে রোলটা করতে চেয়েছিলাম। তখন অবধি মানিকদা

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে চরিত্রটা অভিনয় করানোর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল ওই ভূমিকার যে কম বয়সের অংশটা আছে সেটার পক্ষে উনি বড্ড বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন, তখনই আমি রোলটা করতে চাই। মানিকদা বললেন— ‘যুবক ও মধ্যবয়স্ক— মেরেকেটে প্রৌঢ় অবস্থাটা তোমাকে মানায় হয়ত, কিন্তু তোমাকে দিয়ে আবার খুব বেশি বুড়োর অংশ তো হবে না।’ আমি বলেছিলাম ‘কেন, মেকআপে তো করা যায়?’ উনি মানেননি। বলেছিলেন, ‘না না, আমাদের দেশে মেকআপ অত ভাল হয় না।’

বেশ কয়েক বছর পরে যখন রাজা মিত্রের পরিচালনায় ‘একটি জীবন’ ছবির প্রধান ভূমিকাটি আমি করতে যাব, তখন মানিকদাকে বলেছিলাম। মানিকদা মাঝে মাঝেই জানতে চাইতেন ছবিটার কাজ কতদূর এগোল— কেমন হচ্ছে— কোথায় কোথায় লোকেশন— মেকআপের কী করা হল ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ে। তখন যদিও আমার বয়স আরও খানিকটা বেড়েছে কিন্তু অতিবৃদ্ধের চামড়ার কুঞ্জন অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও ঠিকমত স্বাভাবিক হয়নি বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। এদেশে মেকআপে তো second skin করা যায় না। একদিন কথায় কথায় মানিকদাকে আমার সেই অতৃপ্তিটা বলতেই আমাকে বললেন— ‘তোমাকে তো আমি তখনই বলেছিলাম— আমাদের দেশে ওরকম মেকআপ হয় না।’

‘ঘরে বাইরে’ শেষ করার আগে মানিকদার হার্ট অ্যাটাক হল। যেটুকু শুটিং করা বাকি ছিল তা শেষ করল সন্দীপ। তারপর তো বেশ কয়েকটা বছর বেরিয়ে গেল মানিকদার আবার কাজের মধ্যে ফিরতে। এই সময়টা যে কী মনোকষ্টে কেটেছে! এক-এক সময় মনে হত মানিকদা বোধহয় আর ছবি করতে পারবেন না। তখন ডাক্তারদের ওপর রাগ হত— কিন্তু তাঁরাই বা কী করবেন? রোগের এবং রুগীর গুরুত্ব বুঝেই নিশ্চয় তাঁরা মানিকদাকে অনেকদিন শুটিং করার অনুমতি দেননি। আমি কিন্তু অবুঝের মত ভাবতাম, চিরকালই তো মানিকদা শুটিং করার সময় সব থেকে সুস্থ থাকেন— ছবি করাটাই তো ওঁর খেরাপি, কেন ছবি করতে দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা। এ নিয়ে মানিকদার সঙ্গে কথাও হত। কিন্তু উনি খুব ডিসিপ্লিন্ড মানুষ ছিলেন। ডাক্তারদের কথা অমান্য করতেন না। কিন্তু ছবি করতে পারছেন না বলে ওঁর যে কী কষ্টটা হচ্ছে তখন বুঝতে পারতাম। সেই সময় একদিন ওঁর

স্বভাবসিদ্ধ যেন-কিছুই-নয় এমনি নিরাবেগ গলায় বলেছিলেন— ‘যদি ছবিই না করতে পারি তাহলে তো বেঁচে থাকারও কোনও মানে হয় না।’

সত্যজিৎ রায় বেঁচে আছেন অথচ ছবি করছেন না, এই ভয়াবহ দুঃখের মধ্যে তাঁকে বা তাঁর দেশবাসীকে অবশ্য বেশিদিন থাকতে হয়নি। মানিকদা শেষ পর্যন্ত আবার ছবি করতে পেরেছিলেন। ডাক্তারদের কাছ থেকে পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ছবির কাজে হাত দেওয়ার অনুমতি পাওয়ার আগে, সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর ওপর একটি তথ্যচিত্র করলেন মানিকদা। এতে ভাষ্যপাঠের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমার ওপর। আমি তাতে প্রচণ্ড খুশি হওয়ার সঙ্গে একটু বিস্মিতও হয়েছিলাম। কারণ এর আগে রবীন্দ্রনাথ এবং বিনোদবিহারীর ডকুমেন্টারিতে মানিকদা নিজেই ভাষ্যপাঠ করেছিলেন। এবং ওই শব্দবিনিমিত কণ্ঠস্বরের অপূর্ব উচ্চারণ এখনও মনকে আছন্ন করে। মানিকদাকে যখন জিজ্ঞেস করি ‘আপনি নিজে কেন করছেন না?’ তখন বলেছিলেন— ‘না, বাবার ওপর ডকুমেন্টারি তো, আমার নিজের না করাই ভাল। আর ওই কবিতাটিবিতা থাকবে, ওগুলো তোমারই ভাল হবে।’ এই উত্তরের প্রথম অংশটাই বোধহয় আসল কারণ, দ্বিতীয় অংশটা আমি অন্তত ঠিক বলে মনে করিনি। মানিকদার মুখে আবোলতাবোলের কবিতা বা মণ্ডা ক্লাবের আমন্ত্রণী ছড়া যে অসাধারণ অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হতই, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সংশয়ই নেই।

‘সুকুমার রায়’ তথ্যচিত্রে ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’-এর দৃশ্যাংশে আমি অভিনয়ও করেছিলাম। ছবি দেখার পর যখন মানিকদাকে বলেছিলাম যে ডকুমেন্টারি আমার অসম্ভব ভাল লেগেছে, তখন কি জানি মানিকদারও বয়স হচ্ছে বলেই হোক বা যে-কোনও কারণেই হোক আমাকে বললেন— ‘তার পেছনে তোমার contribution-ও কম নয়। খুব ভাল কমেডি পড়া হয়েছে।’

শেষ পর্যন্ত মানিকদা ডাক্তারদের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন ফিচার ফিল্ম করার— কিন্তু একটা শর্তে যে আউটডোরে কাজ করবেন না, সমস্ত শুটিং স্টুডিওতেই করতে হবে। এই জন্যেই নাটক থেকে ছবি করার স্থির করেন এবং দীর্ঘদিনের ভাললাগা ইব্‌সেনের ‘এনিমি অফ দি পিপল’ বেছে নেন। এই ‘গণশত্রুর’ চিত্রনাট্য বা সংলাপও মানিকদা বেশ কয়েকবার

পরিমার্জনা করেছিলেন। এই ছবি থেকেই মানিকদা ক্যামেরা নিজে অপারেট করার কাজটা বন্ধ করে সন্দীপকে সেই ভার দেন। আমি অসুস্থতার পর থেকেই এ নিয়ে ওঁকে বলতাম। কেননা পৃথিবীর বেশিরভাগ পরিচালকই তো নিজে ক্যামেরা অপারেট করেন না— ওই শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজটা না করেও তো ভাল ছবি তৈরি করা যায়। এ ব্যাপারটা মানিকদা মন থেকে মেনে নিয়েছিলেন, আর সন্দীপের ওপর এক্ষত্রে তাঁর ভরসাও ছিল। যেটা মেনে নিতে পারছিলেন না, সেটা হল আউটডোরে কাজ না করতে পারাটা। বলতেন— ‘বারবার এরকম গল্প কী করে বাছা যায় যা শুধু সেটের মধ্যেই থাকবে— তাছাড়া আউটডোর থাকলে আলাদা একটা richness আসে।’

গণশত্রুর প্রথম দিন শুটিংয়ে এত ভিড় হয়েছিল সেটে যে মানিকদা শুটিংয়ের পর একটু অসুস্থই বোধ করতে থাকেন। পরের দিন সকালে স্টুডিওতে গিয়ে শুনি মানিকদা তখনও আসেননি, শরীরটা ভাল নেই। একটু পরে আসবেন। যে মানিকদা সকলের আগে স্টুডিও আসেন, তাঁর আসতে একটু দেরি হবে শুনে খুব আশঙ্কা হল। তবে কি মানিকদা ছবিটা শেষ করতে পারবেন না? যাই হোক মানিকদা একটু পরেই এসে গেলেন, শুটিং আরম্ভ হল। প্রথম দুটো দিন আমাকে প্রায় কোনও নির্দেশই মানিকদা দিচ্ছিলেন না। তাতেও আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মানিকদা আগের মত সজাগ সতর্ক আছেন তো! তৃতীয় দিন সকালে একটা শটে সংলাপটা বলেই আমার মনে হল, আমি একটা ভুল জায়গায় জোর দিয়ে কথাটা বলেছি। শট শেষ হতেই সন্দীপ আর একটা টেক করতে চাইল অপারেশনের কোনও খুঁতের জন্য। তখুনি মানিকদা আমাকে বললেন— ‘সৌমিত্র শটটা যখন আর একবার টেক করা হচ্ছে, তখন ওই জায়গাটায় এম্ফ্যাসিস দিও না—’ আমার কাছে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল যে মানিকদা ঠিক আগেরই মতন কাজের ব্যাপারে খুঁটিনাটি সব কিছুর ওপর নজর রাখছেন। পরে তো শুটিংয়ের সব বিভাগে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্ব দেখতেই পেলাম। নতুন ক্যামেরাম্যানকে ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক শটের লাইটিং চেক করে নিতেন— প্রয়োজন মনে করলে অদলবদল করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিতেন।

‘গণশত্রু’-র পরের ছবি ‘শাখাপ্রশাখা’-র আগে মানিকদা আমাকে বলেছিলেন, ‘সৌমিত্র, মাথার ঠিক নেই এরকম চরিত্রের বিহেভিয়র তো অজস্র রকমের হতে পারে— এই চরিত্রটার বিহেভিয়র কী রকম হবে সেটা খুব হিসেব করে ঠিক করতে হবে। তোমাকে তো সব সময়ই আমি অনেক স্বাধীনতা দিয়েছি— কিন্তু এই চরিত্রটায় দুজনে মিলে কাজ করতে হবে।’ তা-ই হয়েছিল। এই চরিত্রের আচার-আচরণের অনেকগুলোই মানিকদা বলে দিয়েছিলেন। যেমন হাত চাপড়ানোর ব্যাপারটা। বলেছিলেন— ‘এ ধরনের চরিত্রের একটা ফিজিকাল ম্যানারিজম থাকলে ভাল হয়। যেমন ধরো সে হাতটা মাঝে মাঝে থাবড়ায়। যখন মিউজিক শোনে তখন একভাবে, আবার যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন আর এক ভাবে হাতটা দিয়ে সোফার হাতলে বা টেবিলে চাপড় মারতে পারে।’ এটা আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল। স্নায়বিক কারণে মানসিক প্রতিবন্ধী এরকম মানুষ আমার দেখা ছিল— তাদের মধ্যে এই ধরনের ফিজিকাল ম্যানারিজম আমি দেখেছি। তাই মানিকদার সাজেশানটা আমি সহজেই নিতে পেরেছিলাম। হাত চাপড়ানোর সঙ্গে বিশেষ করে উত্তেজিত অবস্থায় তালে তালে মাথা নাড়াটা আমি যোগ করেছিলাম।

‘শাখাপ্রশাখা’র পরে আর মানিকদার সঙ্গে ছবি করা হয়ে উঠল না। শেষ যে ছবিটা করবেন বলে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তার প্রধান চরিত্রটার জন্যে আমাকে নির্বাচন করেছিলেন। অন্যান্য বেশিরভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রীও নির্বাচন করে ফেলেছিলেন। পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে ফ্রাগারে যাওয়ার কথা, ২৭ জানুয়ারি অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। আর সুস্থ হলেন না। ২৩ এপ্রিল চলে গেলেন।

এরপর আমার জীবন আর কোনওদিনই আগের মত হবে না। শুধু যে তাঁর এতগুলো ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাই তো নয়, চৌত্রিশ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আমি যা পেয়েছি তা বাবা-মা বা স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়ারই মত— আমার জীবনের, আমার চরিত্রের গড়াপেটার সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে— আমৃত্যুই থাকবে।

কত কী শিখেছি মানিকদার কাছে! মানিকদা তো থিয়েটারের মানুষ ছিলেন না— কিন্তু মানিকদার কাজ করার থেকেই তো বোধহয় শিখেছি— কী করে সমগ্র প্রযোজনার কাজটার দায়িত্ব নিতে হয়। থিয়েটারে যখন নাটক তৈরি করি তখন তাঁর শিক্ষা কাজ করে বৈকি। শুধু এই অপ্রত্যক্ষ প্রভাবই নয়, আমার থিয়েটার করার কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ উপদেশও কত সময় পেয়েছি। আমি কোনও নাটকের রূপান্তর করলেই তাঁকে শোনাতে চাইতাম— তিনি সে সময়ও দিতেন। শুনে আলোচনাও করতেন। তারপর মঞ্চস্থ হলে দেখতেও যেতেন। মনে আছে প্রথম যে প্রযোজনাটা দেখেছিলেন সেটা ছিল ইব্‌সেনের ‘গোস্টস’-এর অনুবাদ ‘বিদেহী’। দেখে সেট, আলো, অভিনয় ও অন্য বহু খুঁটিনাটির প্রশংসা করলেও আমার সঙ্গীতের ব্যবহার তিনি অনুমোদন করেননি। ওই নাটকে আমি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিক বহুল ব্যবহার করেছিলাম। সেই ব্যবহার নাটকের সংলাপকে অনেক সময় চাপা দিয়েছিল বা সংলাপের প্রতি মনঃসংযোগে বাধা দিয়েছিল বলে মানিকদা সমালোচনা করেছিলেন। মনে আছে বলেছিলেন, ‘সিনেমায় যেমন mixing করে সংলাপের সঙ্গে আবহসঙ্গীতের একটা ব্যালান্স করা যায় থিয়েটারে তো তেমনভাবে সম্ভব নয়। থিয়েটারে সংলাপটা ভীষণ বড়— তাকে চাপা দিয়ে দেয় এমনভাবে আবহ না বাজানোই ভাল।’ অভিনেতৃ সংঘের পরের নাটক ‘রাজকুমার’ দেখে বলেছিলেন— ‘ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মূল চরিত্রটা সব জায়গাতেই এক— তাই না? এক্সপ্লোরেশনটা একই রকমের। তোমার অ্যাডাপ্টেশন খুব ভাল হয়েছে। অভিনয়টভিনয়ও খুব ভাল। কিন্তু তোমার ওই ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকালের ব্যবহার সম্বন্ধে এখনও আমার কিছু আপত্তি আছে। নাটকে আরও কম আবহসঙ্গীত ব্যবহার করাই ভাল— আর ট্রাজিক মুহূর্তে নায়ক যে রেকর্ডটা শুনছে বেটোভেনের ওই ভায়লিন কনচের্টোটা বড্ড Joyous। ওটা ঠিক ও জায়গায় যাচ্ছে না।’ এসবের থেকে সঙ্গীতের ব্যবহার নাটকে কীভাবে করব তার খানিকটা ধারণা নিশ্চয় আমার তৈরি হয়েছিল। অন্তত আমার পরের নাটকগুলো দেখে সঙ্গীত নিয়ে মানিকদা আর কোনও আপত্তি করেননি বরং ভালই লেগেছিল জানিয়েছিলেন।

এই পান্চাত্য সঙ্গীত শোনার ব্যাপারেও মানিকদা কত সাহায্য করেছেন। মানিকদার সংস্পর্শে আসার আগে এ সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু ভাসাভাসা

ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মানিকদার সঙ্গে পরিচয়ের পরই বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম পাশ্চাত্য সঙ্গীতে খুব অল্প বয়েস থেকেই ওঁর কী প্রগাঢ় অনুরাগ এবং কী বিস্তারিত জ্ঞান। সেই সঙ্গে সাধারণভাবে সঙ্গীতে কতখানি মনোজ্ঞ ছিলেন তিনি, তা তাঁর সঙ্গে মেলামেশার থেকেই বুঝতে শুরু করেছিলাম। অপূর সংসারের গুটিং যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় বর্ধমানে আমার বন্ধুদের মাধ্যমে জ্যোতি বসু বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তখন তিনি বর্ধমান জেলারই একটি ব্লকে বি. ডি. ও. ছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। তাঁর আমন্ত্রণে কয়েকটা দিন তাঁর গ্রামের কোয়ার্টারে গিয়ে আমি কাটিয়েছিলাম। সে কদিন প্রায় সারা দিনরাস্তিরই তিনি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকের গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন এবং সে-সব সঙ্গীত ও তার কম্পোজারদের সম্বন্ধে নানান রকম আলোচনা গল্প করেছিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরেই আমি মানিকদাকে আমার এই বেড়ানোর গল্প বলি এবং ওঁকে জিজ্ঞাসা করি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনতে হলে প্রথমে কী কী শোনা উচিত। মানিকদা তখন বলেন উনি তার একটা তালিকা তৈরি করে দেবেন এবং দু-একদিনের মধ্যে সত্যিসত্যিই একটা লিখিত তালিকা আমাকে দেন। একটু-আধটু যা পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনেছি, শৃঙ্খলার সঙ্গে তা শোনার শুরু হয় তার থেকেই। নিজের রেকর্ডপ্লেয়ারে বাজিয়ে অনেক সময় রেকর্ড শোনাতেন মানিকদা।

পরবর্তীকালে আমার ছেলে সৌগত যখন ভায়লিন ও ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল শিখতে থাকে সে সময় ওর জন্য আমি একটা বিদেশি বেহালা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। মানিকদা তখন ওঁর দাদু উপেন্দ্রকিশোরের অব্যবহৃত, পড়ে থাকা বেহালাটি সৌগতকে দিয়েছিলেন। অবশ্য এ ঘটনাটা উল্লেখ করার দরকার ছিল না— করলাম কারণ আজ যখন তিনি নেই তখন কতভাবে যে তাঁর কাছে ঋণী তা বারবারই মনে হচ্ছে।

শুধু সঙ্গীতই নয়, শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের কত দিকেই না ছিল তাঁর আকর্ষণ ও দখল। তাঁর অধিগত সেই জ্ঞানের আলোয় আমার কত অজ্ঞানতার অন্ধকারই না কেটে গেছে। এমন অবিশ্মরণীয় শিল্পী, এরকম দরদী অভিভাবকের মত বন্ধুর অনুপস্থিতিতে কেবলই যখন মনে হয় জীবনের অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেল, অনেকটাই অর্থশূন্য হয়ে গেল, তখন এক

বিদেশিনী বঙ্কুর একটি সাস্থনাবাক্য আমার মনে পড়ে যায়। তিনি মানিকদার ভীষণ ভক্ত ও পরিচিতা। মানিকদার মৃত্যুর পরের দিন যখন তাঁর দেহ সারাদিন দর্শনার্থীদের জন্যে নন্দনে শায়িত ছিল, সেইদিন কোনও সময়ে আমাকে নিতান্ত সন্তুষ্ট ও বিপর্যস্ত দেখে বিদেশিনী বঙ্কুটি আমাকে বলেছিলেন, ‘Don’t cry Soumitra, Manikda has given you a heritage’.

এ কথা মনে পড়লে মনে হয় মৃত্যুতে মানিকদার শেষ হয়নি। আমার জীবনে তো নয়ই। মানিকদার কাছ থেকে যা পেয়েছি তার জন্যেই বাকি আয়ুকালটা বাঁচা যায়— কাজ করার প্রেরণা পাওয়া যায়।



## সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সৌমিত্র



১৯৫৯

### অপূর সংসার

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

সঙ্গীত

অভিনয়

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন

সত্যজিৎ রায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুব্রত মিত্র

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

দুলাল দত্ত

রবিশঙ্কর

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অপু), শর্মিলা ঠাকুর,

আলোক চক্রবর্তী, স্বপন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ছায়াবানী প্রাইভেট লিমিটেড

১ মে ১৯৫৯



১৯৬০

### দেবী

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

সঙ্গীত

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন

সত্যজিৎ রায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সুব্রত মিত্র

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

দুলাল দত্ত

আলি আকবর খাঁ

অভিনয়

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ



১৯৬১

তিনকন্যা

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও

পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ



১৯৬২

অভিযান

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও

পরিচালনা

ছবি বিশ্বাস, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র  
চট্টোপাধ্যায় (উমাপ্রসাদ রায়), করুণা  
বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।  
জনতা পিকচার্স অ্যান্ড থিয়েটার্স লিমিটেড  
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন

সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ছোট গল্প :  
পোস্টমাস্টার, মণিহারী ও সমাপ্তি।

সৌম্যেন্দু রায়

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

দুলাল দত্ত

‘সমাপ্তি’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়  
(অমূল্য) অপর্ণা দাশগুপ্ত, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ।

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

৫ মে ১৯৬১

অভিযাত্রিক

সত্যজিৎ রায়

কাহিনী  
আলোকচিত্র  
শিল্প নির্দেশনা  
সম্পাদনা  
অভিনয়

তারাপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়  
সৌম্যেন্দু রায়  
বংশী চন্দ্রগুপ্ত  
দুলাল দত্ত  
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (নরসিং), ওয়াহিদা  
রহমান, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রুমা  
গুহঠাকুরতা, চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ  
প্রমুখ।

পরিবেশক  
মুক্তির তারিখ

ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড  
২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২



১৯৬৪

চরুপত্নী  
প্রযোজনা  
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও  
পরিচালনা  
কাহিনী  
আলোকচিত্র  
শিল্প নির্দেশনা  
সম্পাদনা  
অভিনয়

আর. ডি. বনশল

সত্যজিৎ রায়  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
সুব্রত মিত্র  
বংশী চন্দ্রগুপ্ত  
দুলাল দত্ত  
মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,  
(অমল), শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল  
ঘোষাল, গীতালী রায় প্রমুখ।

পরিবেশক  
মুক্তির তারিখ

আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং  
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

১৯৬৫

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত

ও পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ



১৯৬৯

অরণ্যের দিনরাত্রি

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত

ও পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

আয়. ডি. বনশল

সত্যজিৎ রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র (কাপুরুষ)

পরশুরাম (মহাপুরুষ)

সৌমেন্দু রায়

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

দুলাল দত্ত

‘কাপুরুষ’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অমিতাভ রায়), মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং

৭ মে ১৯৬৫

প্রিয়া ফিল্মস

সত্যজিৎ রায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সৌমেন্দু রায়

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অসীম চ্যাটার্জি), শর্মিলা ঠাকুর, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, সিমি, পাহাড়ী সান্যাল, কাবেরী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিবেশক  
মুক্তির তারিখ



১৯৭৩

অশনি সংকেত (রঙিন)

প্রযোজনা  
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত  
ও পরিচালনা  
কাহিনী  
আলোকচিত্র  
শিল্প নির্দেশনা  
সম্পাদনা  
অভিনয়

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড  
১৬ জানুয়ারী ১৯৭০

বলাকা মুভিজ  
সত্যজিৎ রায়  
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
সৌম্যেন্দু রায়  
অশোক বসু  
দুলাল দত্ত  
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী),  
ববিতা, সন্ধ্যা রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ।  
বলাকা মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেড  
১৫ আগস্ট ১৯৭৩ (করমুক্ত)

পরিবেশক  
মুক্তির তারিখ



১৯৭৪

সোনার কেদারা (রঙিন)

প্রযোজনা  
কাহিনী, চিত্রনাট্য,  
সঙ্গীত ও পরিচালনা  
আলোকচিত্র  
শিল্প নির্দেশনা  
সম্পাদনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার  
সত্যজিৎ রায়  
সৌম্যেন্দু রায়  
অশোক বসু  
দুলাল দত্ত

অভিনয়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (প্রদোষ মিত্র ওরফে ফেলুদা), সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, কুশল চক্রবর্তী, কামু মুখোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।  
ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড  
২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪ (করমুক্ত)

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ



১৯৭৮

জয়বাবা ফেলুনাথ (রঙিন)

প্রযোজনা

কাহিনী, চিত্রনাট্য,

সঙ্গীত ও পরিচালনা

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

আর. ডি. বনশল

সত্যজিৎ রায়

সৌম্যেন্দু রায়

অশোক বসু

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (প্রদোষ মিত্র ওরফে ফেলুদা), সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, উৎপল দত্ত, জিৎ বসু, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ

আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং

৫ জানুয়ারি ১৯৭৯



১৯৮০

হীরক রাজার দেশে (রঙিন)

প্রযোজনা

কাহিনী, চিত্রনাট্য,

সঙ্গীত ও পরিচালনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সত্যজিৎ রায়

আলোকচিত্র  
শিল্প নির্দেশনা  
সম্পাদনা  
অভিনয়

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ



১৯৮৪

ঘরে বাইরে (রঙিন)

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত

ও পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ

সৌম্যেন্দু রায়

অশোক বসু

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (উদয়ন পণ্ডিত),  
উৎপল দত্ত, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি  
ঘোষ, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট  
কর্পোরেশন

১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০ (করমুক্ত)

এন. এফ. ডি. সি.

সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌম্যেন্দু রায়

অশোক বসু

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সন্দীপ), স্বাতীলেখা  
সেনগুপ্ত, ভিক্টর ব্যানার্জি, মনোজ মিত্র,  
ইন্দ্রপ্রতিম রায়, গোপা আইচ, জেনিফার  
কাপুর প্রমুখ।

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

৪ জানুয়ারি ১৯৮৫

১৯৮৯

গণশত্রু (রঙিন)

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত

ও পরিচালনা

কাহিনী

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

এন. এফ. ডি. সি.

সত্যজিৎ রায়

হেনরিক ইব্‌সেন

বরুণ রাহা

অশোক বসু

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (ডাঃ অশোক গুপ্ত),

রুমা গুহঠাকুরতা, মমতাক্ষর, ধৃতিমান

চট্টোপাধ্যায়, দীপকর দে, শুভেন্দু

চট্টোপাধ্যায়, রাজারাম যাজ্ঞিক প্রমুখ।

জগৎ সিং দুগার

১৯ জানুয়ারি ১৯৯০

পরিবেশক

মুক্তির তারিখ



১৯৯০

শাখাপ্রশাখা (রঙিন)

প্রযোজনা

জেরার্ড দেপার্দ্যু ও ড্যানিয়েল টোসক্যান দ্য  
প্ল্যানটিয়ের

কাহিনী, চিত্রনাট্য,

সঙ্গীত ও পরিচালনা

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়

সত্যজিৎ রায়

বরুণ রাহা

অশোক বসু

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (প্রশান্ত), অজিত

বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়,

দীপকর দে, রঞ্জিত মল্লিক, লিলি চক্রবর্তী,

মমতাক্ষর প্রমুখ।



পরিবেশক  
মুক্তির তারিখ  
তথ্যচিত্র



১৯৬১

রবীন্দ্রনাথ

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, পরিচালনা

ও ধারাভাষ্য

সঙ্গীত

আলোকচিত্র

শিল্প নির্দেশনা

সম্পাদনা

অভিনয়



১৯৮৭

সুকুমার রায়

প্রযোজনা

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত

ও পরিচালনা

আলোকচিত্র

সম্পাদনা

ধারাভাষ্য

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম  
৫ মে ১৯৯১ (দূরদর্শনে প্রদর্শিত)

ফিল্মস ডিভিশন, ভারত সরকার

সত্যজিৎ রায়

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সৌম্যেন্দু রায়

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ('বাস্মিকি প্রতিভা'  
নাটকে), রায় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সত্যজিৎ রায়

বরুণ রাহা

দুলাল দত্ত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’  
নাটকে ‘রাম’-এর ভূমিকায়), উৎপল দত্ত,  
সন্তোষ দত্ত, তপেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

[ সঙ্কলন : দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ]





সত্যজিৎকে ছোটবেলা থেকেই কাছ থেকে দেখেছেন জেনেছেন কয়েকজন। কিন্তু মূল কর্মক্ষেত্রে কাছাকাছি থাকতে থাকতেই মানুষ সত্যজিতের কাছে যিনি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁর নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। জগৎ ও জীবনের নানা দিকে গভীর আগ্রহ ছিল সত্যজিতের। সেই আগ্রহের অংশীদার সৌমিত্র হয়েছেন স্বভাবতই। অমর চলচ্চিত্রকারের চোদ্দটি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় দু-জনের সম্পর্কের একটি দিক মাত্র, বন্ধনের সূত্র ছড়ানো ছিল জ্ঞান ও জীবনচর্চার নানা শাখাপ্রশাখায়। চিরাচরিত গুণমুগ্ধ শ্রদ্ধার্থ্য নয়, এই গ্রন্থ সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণ ও স্মৃতিচারণ। পাঠকপাঠিকারা এই বই পড়ার পর অনিবার্য প্রশ্ন তুলবেন : কবে এ বিষয়ে আরও অনেক বড় বই লিখবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়?